

সূচিপত্র

নাগরিক উদ্যোগ

ত্রৈমাসিক

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক প্রকাশনা

বর্ষ: ১৫, সংখ্যা: ১ম, অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৫

সম্পাদক

জাকির হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

জাকির হোসেন

বাসন্তি সাহা

মোসাম্মৎ লাকী আক্তার

সুলতান মো: সালাউদ্দিন সিদ্দিক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

ফয়সাল এজাজ রিসান

আলোকচিত্র

নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক

সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি

লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ

ডি. এস. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৩৪/ ডি,

নিউ এলিফ্যান্ট রোড

ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫০ টাকা

যোগাযোগ

ফোন: ৪৮১২২৮২৯, ফ্যাক্স: ৪৮১২১৪৫৫

মোবাইল: ০১৭১৩১৩১৩৪৮,

০১৭১৩০৮১৮৫২

ই-মেইল: nupublication2012@gmail.com



পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে মূল্যায়ন করতে হলে তার গোড়ায় গলদের কথা বলতে হবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হল অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু ১৯৭১ সালে বহু আদিবাসীর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সমান্তরাল অবদান থাকলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে বাঙালি ভিন্ন অপরাপর আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের সেই অধিকারের স্বীকৃতি মিলেনি। সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদ বিতর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সাংসদ, পাহাড়ের অবিসাংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংসদে দেয়া সেই ভাষণ- "আমার চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই আমি বাঙালি" কে উপেক্ষা করে সংবিধানের ৬(খ) ধারা পাস করা হল।

বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ গড়তে অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দিতে হবে এবার

২০২৫ এর মাঝামাঝি বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ৮২০ ডলার। টাকার অঙ্কে যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার কাছাকাছি। মাথা প্রতি এরকম আয় হিসাব করা হয় জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। মাথাপিছু আয়ের বড় অঙ্ক দেখিয়ে নীতিনির্ধারকরা বাহবা পেলেও এতে সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রকৃত আয়ের অবস্থা বোঝা যায় না। দেশে ২০ ভাগের মতো মানুষ যে দরিদ্র সেটা সমকালীন বহু গবেষণাতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কম করে হলেও ৩-৪ কোটি মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। যারা মাসে খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ৩ হাজার ৮২২ টাকাও খরচ করতে পারছে না বা যাদের মাসে আয় সোয়া দুই ডলারের কম।

যা আছে

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

০৩

বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ গড়তে অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দিতে হবে এবার

০৮

বাংলাদেশে দলিত নারীদের জেভার সমতা ও ক্ষমতায়ন: একটি কাঠামোগত পর্যালোচনা

১৪

COP 30 পরবর্তী বাংলাদেশ: জলবায়ু ন্যায়বিচার ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংকট

১৯

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি দেশের দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তরুণ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতা এবং রাজস্ব ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমন্বয়যোগ্য ও কার্যকর অর্থনৈতিক সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, রাজস্ব খাতে সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সহজ এবং প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে। কর ফাঁকি রোধ, করের আওতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো গেলে সরকারের উন্নয়ন ব্যয় আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, শিল্প ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা প্রয়োজন। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে অবকাঠামো উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক জটিলতা কমানো গুরুত্বপূর্ণ।

কেবল অর্থনৈতিক সংস্কার নয়, সামাজিক সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল যাতে সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়, সে জন্য দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার, তাদের স্বশাসন কাঠামোর কার্যকারিতা, তাদের জীবনের নিরাপত্তা এসব প্রশ্নেরও একটি কার্যকর সমাধান খুঁজতে হবে। রাষ্ট্রের উন্নয়নে তাদেরও সাথে নিতে হবে। উন্নয়ন যদি কেবল উচ্চবিত্ত মানুষকে সুবিধা দেয় আর আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবে উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না।

অন্যদিকে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও প্রত্যন্ত উপকূল, চর, হাওর, দলিত, আদিবাসী, চা শ্রমিকরা রয়ে গেছে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার বাইরে। এটা একদিকে যেমন এসডিজির ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ দর্শনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তেমনি উক্ত জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া বিশেষ মানুষ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিশেষায়িত সেবারও ঘাটতি রয়ে গেছে। একটি দেশের উন্নয়ন তখনই উন্নয়ন যখন একটি দেশের সব শ্রেণী, গোষ্ঠীর মানুষ তাদের অধিকার উপভোগ করতে পারে। একটি জবাবদিহিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারী, দলিত, আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সকলের সমান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।



পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

ড. খায়রুল চৌধুরী ও
সতেজ চাকমা

মানবাধিকারের ধারণাটি মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও সমঅধিকারের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার পর গৃহীত ১৯৪৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘ সনদ (The United Nations Charter) ঘোষণা করে “মানবাধিকারের প্রতি বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মানব ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্য রক্ষা করা” হবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও ন্যায়ের ভিত্তি। ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) এই ঘোষণা বাস্তব রূপ পায়, যেখানে বলা হয়— “সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, মর্যাদা ও অধিকারে সমান।” এই ঘোষণাই আজকের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর ভিত্তি। পরবর্তীতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR, ১৯৬৬) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights ICESCR, ১৯৬৬) বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তিদুটো মানবাধিকারের এই নীতিগুলোকে আইনি রূপ দিয়েছে। বাংলাদেশ ২০০০ সালে এই দুই চুক্তি অনুসমর্থন করে, ফলে রাষ্ট্র হিসেবে মানবাধিকার রক্ষা, প্রতিরক্ষা ও বাস্তবায়নের আইনি বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। এছাড়া, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP, ২০০৭) আদিবাসী জনগণের জমি, সংস্কৃতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় – যা পার্বত্য চট্টগ্রামের (CHT) প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ (International Labor Organization Convention No. ১০৭. ১৯৫৭) ১৯৭২ সালে অনুমোদন করেছে, যা আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ভূমি, শ্রম ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে বাধ্য করে। জাতীয় পর্যায়ে, বাংলাদেশের সংবিধান মানবাধিকারের মৌলিক ভিত্তি স্থাপন

করেছে— অনুচ্ছেদ ১১(ক) বলা হয়েছে, “ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা” হবে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি। অনুরূপভাবে

- অনুচ্ছেদ ২৭ সকল নাগরিকের আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইনের সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- অনুচ্ছেদ ২৮ বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে।
- অনুচ্ছেদ ৩১ আইনগত সুরক্ষা অধিকারকে জন্মগত অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- অনুচ্ছেদ ৩২ জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করেছে।
- এছাড়া অনুচ্ছেদ ৩৬-৪৪ নাগরিকদের চলাফেরা, মতপ্রকাশ, ধর্ম, সংগঠন ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করে।

এই সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির যৌথ কাঠামো রাষ্ট্রের উপর



একটি দ্বৈত দায়িত্ব আরোপ করে:

প্রথমত:

নাগরিকদের সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা দেওয়া, এবং

দ্বিতীয়ত:

আইনের সামনে সমান বিচার নিশ্চিত করা।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের সামরিকীকরণ, ভূমি দখল, এবং বিচারহীনতা এই প্রতিশ্রুতিগুলোকে বারবার লঙ্ঘন করেছে। নারী, শিশু ও আদিবাসী পুরুষদের উপর সংঘটিত সহিংসতা, দমনমূলক অভিযান, ও অপরাধের বিচারহীনতা শুধু জাতীয় আইনকেই ব্যর্থ করে না, বরং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনও ঘটায়।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তি এই ন্যায় ও স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ধারাবাহিক সহিংসতা, দায়মুক্তি এবং প্রশাসনিক অনীহা এই প্রতিশ্রুতিকে অসম্পূর্ণ রেখেছে। ফলে বিচারহীনতার অবসান ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা এখন শুধু রাজনৈতিক দাবি নয় – এটি একটি আইনগত ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যা বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন

(জাতিসংঘ সনদ, UDHR, ICCPR, ICESCR, UNDRIP, ILO ১০৭) উভয় প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের এক দশমাংশ জায়গা জুড়ে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামও তেমন একটি অঞ্চল যেখানে আদিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের মূল সূত্রপাত হয় ১৯৬০ এর দশকের শুরুতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান আমলে এই বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে ইউএসএইড এর মাধ্যমে অর্থায়ন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে ১৩০৬ বর্গকিলোমিটার আদিবাসীদের ভূমি বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। যেখানে ৫৪ হাজার একর ছিল উর্বর ফসলি জমি। এতে ১৮০০০ পরিবারের ১০০০০০ (এক লক্ষ) এর বেশি আদিবাসী যারা ছিল ঐ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ২৫% তারা নিজেদের বাস্তুভিটা ছেড়ে ভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ এবং কিছুসংখ্যক মায়ানমারে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভুক্তভোগী সাধারণ আদিবাসীদের সাথে কোনোরূপ আলোচনা

ছাড়াই এই বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর সংঘটিত এই মানবিক বিপর্যয় পরবর্তী সকল জীবনধারা ও সংগ্রামকেও প্রভাবিত করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে মূল্যায়ন করতে হলে তার গোড়ায় গলদের কথা বলতে হবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হল অধিকারের স্বীকৃতি। কিন্তু ১৯৭১ সালে বহু আদিবাসীর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের মতো সমান্তরাল অবদান থাকলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে বাঙালি ভিন্ন অপরাপর আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের সেই অধিকারের স্বীকৃতি মিলেনি। সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদ বিতর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সাংসদ, পাহাড়ের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংসদে দেয়া সেই ভাষণ- “আমার চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই আমি বাঙালি” কে উপেক্ষা করে সংবিধানের ৬(খ) ধারায় পাস করা হল- “বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জনগণ বাঙালি হিসেবে গণ্য হইবে.।” এই গলদ থেকেই মূলত এক রৈখিক চিন্তার প্রতিফলনে এক

জাতির দেশ তৈরির সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে লাগল বিগত ৫৪ বছর ধরে। যার ফলে বাঙালি ভিন্ন অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে ক্রমাগত অস্বীকারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় নানা নীতিমালায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়, মূলধারার রাজনৈতিক চরিত্রে, সাহিত্যে, আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এবং নানা পরিসরে আদিবাসীদেরকে ক্রমশ হয় ‘বাঙালিকরণ’ না হয় ‘জাতি-নিধন’(De-peopling) ব্যবস্থায় করে এসেছে এযাবতকালের শাসকগোষ্ঠী।

তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের আন্দোলন দমনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা গ্যারিসন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রমশ যুদ্ধের এক আয়োজন তৈরি করা হয়। এই আয়োজনে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে সমতল জেলাগুলো থেকে পাহাড়ে কমপক্ষে ৪ লক্ষ বাঙালিকে পুনর্বাসন করা হয়, ফলে পাহাড়ের শুধুমাত্র জনসংখ্যা ও জনমিতির পরিবর্তন ঘটে তা নয় বরং সেনাবাহিনী ও বাঙালিদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পায়, যা আজও অব্যাহত আছে।

জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৬-৯৭ পর্যন্ত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের উপর কমপক্ষে ১৬ টি গণহত্যা পরিচালনা করা হয়। সেসব গণহত্যার মধ্যে কাউখালীর কলমপতি গণহত্যা (২৫ মার্চ, ১৯৮০), বরকল গণহত্যা (৩১ মার্চ ১৯৮৪), পানছড়ি গণহত্যা (১ মে, ১৯৮৬), মাটিরাঙ্গা গণহত্যা (১-৭ মে, ১৯৮৬), কুমিল্লাটিলা-তাইন্দং গণহত্যা (১৮-১৯ মে, ১৯৮৬), হিরাচর-সার্বোতুলী-খাগড়াছড়ি-পাবলাখালী গণহত্যা (৮-৯ আগস্ট, ১৯৮৮), লংগদু গণহত্যা (৪ মে, ১৯৮৯), মায়ে গণহত্যা (২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২), লোগাং গণহত্যা (১০ এপ্রিল, ১৯৯২), নানোচর গণহত্যা (১৭ নভেম্বর, ১৯৯৩) অন্যতম।

এসব গণহত্যায় দুই দশকে কমপক্ষে ১ লক্ষ লোক ভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং তাদের বহুলাংশেই নিজেদের বাস্তুভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন।



এছাড়াও আশ্রয়ের খোঁজে অনেক আদিবাসী অভ্যন্তরীণভাবেও উদ্ধাস্ত জীবন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে ভূমি হারিয়ে এখনো পর্যন্ত তারা নিজেদের বাপ-দাদার ভিটেমাটির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। এই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে যত জমি দখল হয়েছে তার সঠিক তথ্য এখনো অজানা।

এসব গণহত্যা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে উল্লিখিত সময়ে আদিবাসীদের উপর নানা ধরনের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যেখানে নারী, শিশু, বৃদ্ধ সকলেই ছিল ভুক্তভোগী। বিশেষ করে সেই সময়ে বহিরাগত সেটলার বাঙালিদের কর্তৃক নানাবিধে ভূমি বেদখল ও পাহাড়ী নারীদের উপর যৌন সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন রাতের আঁধারে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার লাল্যেঘোনা গ্রাম থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদিকা কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা দেশে-বিদেশে এখনও বেশ আলোচিত।

প্রসঙ্গত পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের করা প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ইনসার্জেন্সি

দমনের জন্য নিয়োজিত সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের তৎসময়ের বার্ষিক বাজেট ছিল ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর জন্য দৈনিক ব্যয় ছিল ১.৫ কোটি এবং বার্ষিক ব্যয় ছিল ৫০০ কোটি টাকা।

পার্বত্য চুক্তি পরবর্তী বাস্তবতা

বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে আধিপত্যবাদী মনস্তত্ত্ব '৭১ পরবর্তী শাসকশ্রেণী সংবিধান প্রণয়নের সময় দেখিয়েছিলেন সেই থেকেই পাহাড়ী মানুষের রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী কাঠামো থেকে ছিটকে পড়ে। সেই গলদ থেকে যে সংঘাতের সূত্রপাত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতি সংখ্যায় কম পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর যে নিপীড়ন শুরু করে এবং ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে যে অন্যায় ১৯৭৬-১৯৯৭ পর্যন্ত সময়ে করা হয়েছে তার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি পদক্ষেপ হিসেবে স্বাক্ষর করা হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি। প্রত্যাশা ছিল, এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরবে কাজিত শান্তি। কিন্তু আজ অবধি, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান তো অর্জিত হইনি, বরঞ্চ রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর বৈষম্য ও বঞ্চনা অধিকতর জোরদার হয়েছে, নৃশংস



দমন-পীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনে অবৈধ গ্রেফতার, জেল-জুলুম, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, অপহরণ, ভূমি বেদখল, স্বভূমি ও গ্রাম থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মিথ্যা মামলায় জড়িতকরণ, সাম্প্রদায়িক হামলা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, অধিকার কর্মীদেরকে ক্রিমিনালাইজ করা, নারীর উপর সহিংসতা ও ধর্ষণ ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সর্বশেষ গত ২৩-২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলায় আদিবাসীদের উপর সহিংসতার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এক মারমা আদিবাসী কিশোরীর ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে প্রতিবাদ পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা করেছেন তা দমনের জন্যই ব্যক্তিক সহিংসতা থেকে সামষ্টিক এক সহিংসতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার ফলে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ গুইমারা উপজেলার রামসু বাজারে সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালির ক্রমাগত আক্রমণ ও বুলেটে প্রাণ হারান ৩ জন জুম্ম, আহত হন ২০ জনের অধিক। এছাড়া জুম্মদের ৫৪ টি দোকানপাট, ২৬ টি ঘরবাড়ি ও ১৬ টি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হয়। এতে প্রায় ২৫ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। পাহাড়ে

চুক্তি পরবর্তী মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র নিম্নরূপ:

রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৯৮-২০১১)-এর তথ্যানুসারে ২,৬৬৮ জন জুম্ম এবং কাপেং ফাউন্ডেশন (২০১২-২০২৪) এর তথ্যানুসারে ৬,৪৯৪ জন আদিবাসী, বিগত ২৭ বছরে সর্বমোট ৯,১৬২ জন রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য মতে, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বাঙালি সেটেলার ও সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে ২,৬৬৮ জন জুম্ম। তন্মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটেলার কর্তৃক হত্যার শিকার হয়েছে ৫৪ জন এবং ইউপিডিএফ কর্তৃক ১১০ জন জুম্ম হত্যার শিকার হয়েছে। সেনাবাহিনী ও সেটেলার কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন/মারধরের শিকার হয়েছে ১,৪৬৭ জন, গ্রেফতারের শিকার হয়েছে ৩৬৮ জন, হয়রানির শিকার হয়েছে ৪৪১ জন, সেনাবাহিনীর তল্লাশির শিকার হয় জুম্মদের

৪৮টি ঘরবাড়ি এবং সাজানো মামলার শিকার হয়েছে ২২৮ জন। এছাড়া পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ কর্তৃক ৩২৬ জন অপহরণের শিকার হয়। এদিকে কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে, ২০১২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে ৬,৪৯৪ জন জুম্ম। তন্মধ্যে গ্রেফতারের শিকার হয়েছে ৬৯৪ জন এবং হত্যার শিকার হয়েছে ৭৭ জন জুম্ম। এছাড়া শারীরিক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছে ১,১৫১ জন, হয়রানির শিকার হয়েছে ৮৩১ জন এবং নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে মায়ানমারে পাড়ি জমিয়েছে ২,৮৫৯ জন জুম্ম।

নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৯৮-২০১১)-এর তথ্যানুসারে ১০১ জন জুম্ম নারী ও শিশু এবং কাপেং ফাউন্ডেশন (২০১২-২০২৪) এর তথ্যানুসারে ৪১২ জন আদিবাসী নারী ও শিশু, সর্বমোট ৫১৩ জন নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য মতে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে জুম্ম নারী ও শিশুর উপর

সহিংসতা সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে ১০১ জন। তার মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬৪ জন এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৩৭ জন। কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে ২০১২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে জুম্ম নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে ৪১২ জন। তন্মধ্যে ধর্ষণ ও দলগত ধর্ষণের শিকার হয় ১২২ জন এবং ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছে ৩৫ জন। এছাড়া শারীরিক হামলা ও স্লীনতাহানির শিকার হয়েছে ৮৮ জন, ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে ৮৫ জন, অপহরণের শিকার হয়েছে ২১ জন এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ২৬ জন জুম্ম নারী ও শিশু।

ভূমি সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি সেটেলার কর্তৃক জবরদখল ছাড়াও জুম্মদের ৩,৩৪,৪৮৮ একর প্রথাগত জুম ভূমি ও মৌজা ভূমি জবরদখল করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪০,০৭৭ একর ভূমি বহিরাগতদের নিকট ইজারা দেয়া হয়, সেনানিবাস ও ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে ৭১,৭১১ একর ভূমি জবরদখল করা হয়, বনবিভাগ কর্তৃক জুম্মদের ২,১৮,০০০ একর ভূমি রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা করা হয়, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে সেনাবাহিনী কর্তৃক আনুমানিক ২,৭০০ একর ভূমি জবরদখল করা হয় এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২,০০০ একর ভূমি দখল করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য মতে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে বাঙালি সেটেলার কর্তৃক ২,৪৮৭টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করা হয়। তন্মধ্যে ১,৩১৫ বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। এছাড়া বাঙালি সেটেলার কর্তৃক ১১৭ জন জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি জবরদখল করা হয়। কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে, ২০১২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে ভূমিদস্যু কর্তৃক জুম্মদের ৩২৭টি বাড়িতে

অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, ৩৮৩টি বাড়ি লুট ও তছনছ করা হয়েছে, ৩৬৯ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, ৩,৬২২ পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি দেয়া হয়েছে, ভূমিদস্যুদের হামলায় ৬১৬ পরিবারের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়েছে, ৫,৯৬৬ একর ভূমি ভূমিদস্যুরা জবরদখল করেছে। এছাড়া ক্যাম্প স্থাপনের নামে ৩১৬ একর ভূমি এবং ২,২০৫ একর জায়গা দখলের জন্য ভূয়া দলিল তৈরি করা হয়েছে।

বিচারহীনতা: রাষ্ট্রীয় কাঠামো, নীতি ও সংস্কৃতিগত দায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারহীনতা কোনো বিচ্ছিন্ন বাস্তবতা নয়—এটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক অনীহার সমন্বিত ফল। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও যে সহিংসতা, ভূমি দখল ও সামরিকীকরণের সংস্কৃতি অব্যাহত রয়েছে, তা এই বিচারহীনতাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। ১৯৯৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনে দেখা যায়, হত্যা, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও ভূমি দখলের হাজারও ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলোর বেশিরভাগই কখনো তদন্ত বা বিচার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রভাব তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করেছে; স্থানীয় প্রশাসন মামলার এফআইআর নিতে অস্বীকার করেছে এবং ভুক্তভোগীরা প্রতিশোধের ভয়ে মুখ খুলতে পারেনি। ফলে, বিচারহীনতা আজ এক প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

এই বিচারহীনতা বাংলাদেশের সংবিধানের একাধিক মৌলিক অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অনুচ্ছেদ ২৭ আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা নিশ্চিত করে; অনুচ্ছেদ ৩১ নাগরিকের আইনগত সুরক্ষাকে জন্মগত অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয় এবং অনুচ্ছেদ ৩২ জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণা করে। এই অনুচ্ছেদগুলোর বাস্তবায়ন ব্যর্থ হওয়া মানেই রাষ্ট্রের মৌলিক মানবাধিকার অঙ্গীকার ব্যর্থ হওয়া।

একই সঙ্গে, বাংলাদেশ যে জাতিসংঘ সনদ, UDHR, ICCPR, ICESCR, এবং UNDRIP এর স্বাক্ষরকারী, তার আলোকে আন্তর্জাতিক আইনেও এটি গুরুতর দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তৈরি করে।

বিচারহীনতার সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখা যায় নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায়। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় সংঘটিত ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ও নিখোঁজ হওয়ার বহু ঘটনা এখনও তদন্তের বাইরে রয়ে গেছে। ভুক্তভোগীদের ন্যায্য বিচারপ্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এই সহিংসতা এক ধরনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি তৈরি করেছে, যেখানে অপরাধীরা জানে যে তারা আইনের আওতার বাইরে থাকবে। এই কাঠামোগত বিচারহীনতা দূর করতে হলে শুধু নীতি নয়, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। পার্বত্য শান্তিচুক্তির ধারাগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন, ভূমি কমিশনের পুনঃসক্রিয়করণ ও একটি স্বাধীন মানবাধিকার তদন্ত কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনের পূর্ণ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা বাহিনীর দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ন্যায্যবিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এভাবে বিচারহীনতার অবসান কেবল একটি রাজনৈতিক বা মানবিক প্রশ্ন নয়—এটি রাষ্ট্রের আইনি বৈধতা ও নাগরিক মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা মানে বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও শান্তিচুক্তির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

ড. খায়রুল চৌধুরী

অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

dr.khairul.islam@gmail.com

সতেজ চাকমা

আদিবাসী অধিকার কর্মী

satejchakmadu1998@gmail.com



বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ গড়তে অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দিতে হবে এবার

আলতাফ পারভেজ

গণঅভ্যুত্থান শেষে রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কিছু কাজও হয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কারের বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আগামীতেও কথা হবে। বিগত নির্বাচনে প্রায় সবগুলো দলের নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক সংস্কারের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ছাড়া কেবল রাজনৈতিক সংস্কারে দেশে শান্তি ধরে রাখা কঠিন। সুতরাং বাংলাদেশে এবার অর্থনৈতিক সংস্কারের বিষয়গুলো নিয়েও আলাপ জরুরি।

তীব্র সম্পদ বৈষম্য ও আয় বৈষম্যে করণীয় কী?

বাংলাদেশে অর্থনীতির আয়তন ক্রমে বড় হচ্ছে। বাজেটের আয়তনও বাড়ছে।

৫৪ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়নও অনেক হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু সমাজে আয়বৈষম্য ও ধনবৈষম্যও অনেক। বৈষম্য এখানে শান্তির প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও মানুষের মনযোগ সরিয়ে রাখার জন্য নিয়মিত সাংস্কৃতিক বিতর্ক লাগিয়ে রাখা হয়।

২০২৫ এর ১০ ডিসেম্বর প্যারিস স্কুল অব ইকোনমিকসের ‘বৈশ্বিক অসমতা প্রতিবেদনে’ বাংলাদেশ নিয়ে লেখা হয়েছে, এখানে মোট সম্পদের ৫৮ শতাংশের মালিক সমাজের উপরতলার ১০ শতাংশ ধনী। এদের শীর্ষ ১ শতাংশের কাছে আছে মোট সম্পদের প্রায় ২৫ ভাগ। সমাজের নিচুতলার ৫০ ভাগ মানুষের কাছে আছে জাতীয় সম্পদের মাত্র ৪ দশমিক ৭ ভাগ।

আয়েও তীব্র অসমতা চলছে। জাতীয় আয়ের ৪১ শতাংশ চলে যায় শীর্ষ উপার্জনকারী ১০ শতাংশের হাতে। নিম্ন আয়ের ৫০ শতাংশ মানুষ সবাই মিলে আয় করে মাত্র ১৯ শতাংশ।

অর্থনীতিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা গোষ্ঠীই স্বাভাবিকভাবে জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়। প্রশাসনেও তাদের প্রভাব কয়েম হয়। ২০২৬ এর নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতিদের একচেটিয়া আধিক্য দেখা গেছে। ফলে ধরে নেয়া যায়, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র সামান্যই বদলাতে পারবে। ক্ষমতা পেয়ে ধনী রাজনীতিবিদরা তাদের জন্য সুবিধাজনক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই রক্ষা করতে চাইবেন। বিগত ৫৪ বছরের কোনো

আমলে বৈষম্য কমানোর বিষয় প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। ২০২৪ এর ‘বৈষম্য বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে’র পরও এ বিষয়ে তেমন সফলতা নেই। ফলে বাংলাদেশ আগামীতেও সম্ভাব্য একটা ‘লাল জুলাই’য়ে ঝুঁকিতেই থাকবে।

নাগরিক সমাজে অনেকে মাঝে মাঝে এরকম বলেন যে, সম্পদের অভাবে সকলের জন্য পর্যাপ্ত উন্নয়ন উদ্যোগ নেয়া যাচ্ছে না। সেজন্য বৈষম্য কমছে না।

যুক্তি হিসেবে এটা দুর্বল। তবে বৈষম্যের পাশাপাশি সম্পদের স্বল্পতাও বাংলাদেশে একটা বড় সমস্যা। আবার, বৈষম্য কমাতে হলে কেবল সম্পদের যোগান যথেষ্ট নয়, বৈষম্য কমানোর উপায় নিয়ে ব্যবহারিক ভাবনাও প্রয়োজন।

দারিদ্র্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে সম্পদের খরচের খাত পাল্টাতে হবে

২০২৫ এর মাঝামাঝি বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ৮২০ ডলার। টাকার অঙ্কে যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার কাছাকাছি। মাথা প্রতি এরকম আয় হিসাব করা হয় জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে।

মাথাপিছু আয়ের বড় অঙ্ক দেখিয়ে নীতিনির্ধারণকরা বাহবা পেলেও এতে

সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রকৃত আয়ের অবস্থা বোঝা যায় না। দেশে ২০ ভাগের মতো মানুষ যে দরিদ্র সেটা সমকালীন বহু গবেষণাতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কম করে হলেও ৩-৪ কোটি মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে। যারা মাসে খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ৩ হাজার ৮২২ টাকাও খরচ করতে পারছে না বা যাদের মাসে আয় সোয়া দুই ডলারের কম। এরকম মানুষদের গবেষকরা ‘দরিদ্র’ বলেন।

একদিকে অনেক দরিদ্র, অন্যদিকে গড় আয় বেশ মোটাতাজা। এরকম একটা চিত্রে কিছু ধোঁকাবাজি আছে। যা থেকে অনুমান করা যায়, এখানে আয় ও সম্পদে বিপুল বৈষম্য থাকলেও একদল মানুষ বিপুল আয় করে। বিপুল সম্পদ তাঁদের। অথচ দেশটি প্রতি বছর জুন মাসে অতি কম দেশজ সম্পদ নিয়ে উন্নয়ন বাজেট তৈরি করে। এই কম দেশজ বাজেটের বড় কারণ রাষ্ট্রের আয় কম।

একদিকে সমাজে সম্পদ বৈষম্য, অন্যদিকে, বিপুল সম্পদশালী একটা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী বাংলাদেশের সমাজে গুরুতর ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। তার একটা ছবি মিলে অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ও তার সহযোগী তিন আন্তর্জাতিক সংগঠনের ২০২২-এর জানুয়ারিতে প্রকাশিত Taxing Extreme Wealth নামের প্রতিবেদনে।

সেখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়, প্রায় ৩ হাজার ৫৫০ জনের কাছে ৫ মিলিয়ন ডলার বা তার চেয়ে বেশি করে নীট সম্পদ রয়েছে এখানে। এর মাঝে ৫০ মিলিয়ন ডলার বা তার চেয়ে বেশি করে সম্পদ আছে অন্তত ১৯৫ জনের। এই ১৯৫ জনের যৌথ সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলার সমান। যা নিচুতলার ৫ কোটি বাংলাদেশীর সম্মিলিত সম্পদের চেয়েও ২ দশমিক ৬ গুণ বেশি।

সাদামাটা এক হিসাবে দেখা যায়, এরকম সম্পদশালীদের উপর যদি নতুন করে ৫ শতাংশ সম্পদকর আরোপ করা যায় তাহলে কেবল ১৯৫ ব্যক্তি থেকে ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার কর পাওয়া সম্ভব। টাকার হিসাবে এটা প্রায় ১৬ হাজার ৮০০ কোটি।

দেশজ সম্পদ সংগ্রহের বড় জায়গা সরকারের আদায়কৃত কর। বিভিন্ন ধরনের কর জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার হয়। ফলে কর ব্যবস্থায় সংস্কার করে যদি তার আহরণ বাড়ানো যায় এবং সেটা যদি সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়ন হয় এমন কাজে ব্যবহার করা যায় তবেই কেবল বৈষম্য কমানো সম্ভব। অর্থাৎ একদিকে কর ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বাড়তে হবে। অন্যদিকে, সেই সম্পদ বৈষম্যের শিকার মানুষদের জীবন ও এলাকামুখী করতে হবে। এরকম এলাকা হতে পারে ভৌগোলিকভাবে সীমান্ত এলাকা, শ্রমিকপল্লী, দলিতপল্লী, চর এলাকা, নারী সমাজের খেটে খাওয়া অংশ, আদিবাসী এলাকা ইত্যাদি।

সমাজের কোথায় সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এবং কোথায় দারিদ্র্য বেশি সে বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও শুমারি তথ্য দরকার। বৈষম্য কমানোর যেকোনো জাতীয় উদ্যোগের শুরু হতে পারে এরকম তথ্যব্যাপক তৈরি। এটা শুরুর কাজ। তবে এরকম শুমারির আগেও দরিদ্র এলাকা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলোকে শনাক্ত করা কঠিন নয়। সরকারি-বেসরকারি নানান সংস্থার ইতিমধ্যে করা দারিদ্র্য গবেষণাগুলো এখন কাজে লাগানো যায়।



বৈষম্য থাকলে শান্তি আসবে না

আয়বৈষম্য একটা সামাজিক ব্যাধি। এ থেকে সামাজিক অশান্তি, অসন্তোষ, অস্থিতিশীলতা ও অপরাধপ্রবণতা বাড়ে। বৈষম্যপীড়িত মানুষের ভোগ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণে ব্যয় ও বিনিয়োগ কম থাকে। বৈষম্য তাদের কম আয়, কম পুষ্টি, কম জীবনীশক্তির একটা চক্রে বেঁধে ফেলে। এই চক্রে প্রতিনিয়ত নিজেকে পুনঃউৎপাদন করে। যা ব্যক্তি ও পরিবারের পাশাপাশি দেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অর্থনৈতিক বঞ্চনা যখন বড় একটা জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় পিছিয়ে রাখে সেটা কার্যত দেশকে পিছিয়ে রাখে। তখন মানব সম্পদের বড় অংশ জাতীয় বোঝায় পরিণত হয়। বৈষম্যের শিকার মানুষ, প্রশাসন, রাজনীতি ও ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ায় সহজে প্রবেশ করতে পারে না।

যদি বৈষম্যকে আমরা একটা প্রধান সমস্যা মানি এবং সম্পদ ও আয়ের সুখম বন্টনকে করণীয় ভাবি তাহলে দায়িত্ব হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করা। বিপুল দরিদ্রের মাঝে একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অতিরিক্ত ধনী হওয়ার বাসনায় লাগাম টানতেই হবে।

দরিদ্রমুখী বিনিয়োগের জন্য দেশজ সম্পদ পাবো কোথায়?

বৈষম্য কমাতে এবং সমাজের সুখম অর্থনৈতিক বিকাশে খরচের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বহু ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায়। যেমন, সম্পদকর ব্যবস্থার পুনর্বিবিন্যাস ও সম্প্রসারণ, সংসদ সদস্যসহ নানান জনের জন্য শুদ্ধমুক্ত সুবিধায় গাড়ি আনা বন্ধ করা, ব্যক্তি করদাতার পরিসর বাড়ানো, করহার পুনর্বিবিন্যাস করা, শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির কর বৃদ্ধি, অর্থ পাচার থামানো, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বন্ধ রাখা, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আইন করা, শিল্পের মুনাফায় শ্রমিকের হিস্যা বাড়ানো, নগদ লেনদেন কমিয়ে ব্যাংকে লেনদেন বাড়ানো, অর্থনীতির অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিসরের বড়



মালিকদের সামর্থ্য বিবেচনা করে করের আওতায় আনা, সারচার্জের ফাঁকি বন্ধ করা ইত্যাদি। কর আদায় ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত করা গেলে এবং তাতে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা কায়ম করা গেলেও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ অনেক বাড়বে।

গবেষণা সংস্থা সিপিডি ১২৩টি কোম্পানির উপর এক গবেষণা শেষে ২০২৫ সালের ২১ এপ্রিল প্রাপ্ত ফল তুলে ধরে বলেছিল, ২০২২-২৩ অর্থবছরে করফাঁকির মাধ্যমে আনুমানিক ২ লাখ ২৬ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা বঞ্চিত হয়েছে দেশ। এর মধ্যে করপোরেট করফাঁকি অর্ধেক। ৪৫ শতাংশ কোম্পানির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, কর দেয়ার সময় তাদের কাছে ঘুষ চাওয়া হয়েছিল।

২০২৩ সালে যত টাকা কর ফাঁকির কথা বলেছে সিপিডি-সেটা ২০২৪ সালে আদায়কৃত রাজস্ব ৩ লাখ ৭০ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকার প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগের সমান। তার মানে দুর্নীতি ও করফাঁকি রোধ করে বর্তমান ব্যবস্থাতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ দ্বিগুণ করা সম্ভব। সিপিডি এরকমও দাবি করেছে, বর্তমানে নিবন্ধিত ‘কোম্পানিসমূহের মাত্র ৯ শতাংশ রিটার্ন দেয়।’

তার মানে দেশজ সম্পদ সংগ্রহের বিপুল সুযোগ আছে— যেকোনো বৈষম্যবিরোধী সরকার চাইলে বিপুল সম্পদ আহরণ করতে পারে।

আবার সেই দেশজ সম্পদ সুবিধা বঞ্চিত

জনগোষ্ঠীর দিকে স্থানান্তরেরও সঠিক উপায় খুঁজতে হবে। যার মধ্যে থাকতে পারে: সুবিধা বঞ্চিতদের শিক্ষা সহায়তা, প্রশিক্ষণ সহায়তা, আবাসন সুবিধায় বিনিয়োগ, তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, একটা বিশেষ বয়স শেষে সকলের জন্য পেনশন সহায়তা দেয়া ইত্যাদি।

কর-জিডিপি অনুপাত বাড়বে কীভাবে?

জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্য ছিল ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। পরের বছর ঐ লক্ষ্য ৫ লাখ ৮৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়। রাজস্ব আয়ের এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল জিডিপির প্রায় ৯ শতাংশ। তবে বাংলাদেশে এরকম লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সমস্যা আছে।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ বিভাগের পরিচালক জঁ পেম গত বছর ডিসেম্বরে এক লেখায় বলেছেন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাস্তবে এখানে কর-জিডিপি অনুপাত ছিল ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। এটা দ্বিগুণ হওয়া দরকার। ভারতে এটা একই সময়ে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল। পাকিস্তানে ছিল ১৫ দশমিক ৭০ শতাংশ।

যেকোনো দেশের উচ্চ কর-জিডিপি অনুপাত প্রমাণ করে, সেখানে উন্নয়নের প্রয়োজনে পর্যাপ্ত তহবিল আসছে। অন্যদিকে, কম অনুপাত নির্দেশ করে

সরকার কর আদায়ে দুর্বল। ফলে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নও সীমিত। বাংলাদেশকে এই অবস্থা অতিক্রম করতে হবে। এর মানে এই নয় যে, বিশ্বব্যাপক চায় বলে আমরা সেটা করবো। বাংলাদেশের নিজের স্বার্থে নিজের পরিকল্পনা মতো সেটা করতে হবে।

দেশজ সম্পদ বাড়ানোর বহু জায়গা রয়েছে

এনবিআর ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে কর আসে মোটাদাগে দুই পথে। সরাসরি কর ও পরোক্ষ কর আকারে।

বাংলাদেশে এই লেখা তৈরির সময় আয়করের স্তর ছিল ছয়টি। বছরে সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত। এর পর আয়ের পাঁচটি ধাপে ৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কর ধার্য রয়েছে। চূড়ান্ত ধাপে ৩৫ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি আয়কারীদের পরবর্তী অবশিষ্ট আয়ের উপর ৩০ শতাংশ কর দিতে হয়। এই আয়কর কাঠামো নিয়েও নতুন করে ভাবা যায়।

আয়কর নিয়মের চূড়ান্ত ধাপের শেষে যার ৪০ লাখ পর্যন্ত আয় এবং যার এক কোটি টাকা পর্যন্ত আয় তাদের কর হার কেন সমান হবে? উচ্চ ধনীদেব কর হার ক্রমে আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে কি না সেটা সক্রিয়ভাবে ভাবা যায়। বাংলাদেশে এরকম ধনীদেব সংখ্যা বিপুল বেগে বাড়ছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে তথ্য রয়েছে। ২০২৫ এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে কোটি টাকা বা তার বেশি পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে এমন হিসাবের সংখ্যা ১ লাখ ২৮ হাজার।

যেহেতু আয়করদাতার সংখ্যা কম সেকারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের পুরো ব্যাপারটা এখানে ভ্যাট নির্ভর হয়ে পড়েছে। ১৯৯১ সালে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু হয়। ২০২৫-এর ডিসেম্বরের প্রতিবেদন বলছে, ভ্যাটের মাধ্যমে কর আদায় ২২ গুণ বেড়েছে। ২০০০-০১ অর্থ বছরে ভ্যাট আদায় হয় ৮ হাজার ৭৬৯ কোটি টাকা। আর ২০২৪-২৫ অর্থ

বছরে এর মাধ্যমে রাজস্ব আসে ১ লাখ ৯২ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা।

২০২৫ সালের শুরুতে ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭ লাখ ৭৫ হাজার। বাৎসরিক টার্নওভার ৫০ লাখ টাকার বেশি হলেই নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট দিতে হয়। অর্থাৎ, দিনে ১৩ হাজার ৯০০ টাকা বিক্রি হলেই ভ্যাট দিতে হবে।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রেতার কাছ থেকেই সমন্বয় করে ভ্যাট। এটা দুইভাবে সমন্বয় করা হয়: বিক্রিত দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়ে বা দাম বাড়িয়ে। যেটাই করা হোক সেটা ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ২০২৪ সালে জাতীয় রাজস্বের ৩৮ শতাংশ এসেছে ভ্যাট থেকে।

অনেক অর্থনীতিবিদ বলছেন, সরকার আয়করের পরিসর বাড়তে না পেলে ভ্যাটের পরিসর বাড়ছে। তাতে পরোক্ষ করের চাপ পড়ছে নিম্নবিত্তদের উপর। দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষ যা কিনছেন তার প্রায় সব কিছুতে ভ্যাট রয়েছে। ভোগ্যপণ্যে এরকম কর নিম্ন আয়ের মানুষের জমানো টাকা কমিয়ে ফেলে। অন্যদিকে, আয়করের আওতা ও হার সীমিত থাকার মানে সেটা ধনীদেব জমা রক্ষা করছে।

বিশ্বের অনেক দেশে ভ্যাট রয়েছে। কিন্তু সেখানে আয়করের উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়ার পর এবং দরিদ্রমুখী অনেক আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি ভ্যাট রাখা হয়। বাংলাদেশে সম্পদশালীদের উপর আরও কর বাড়ানোর সম্ভাবনা যথেষ্ট খতিয়ে না দেখেই ভ্যাটের মাধ্যমে দেশজ সম্পদ আহরণে জোর পড়ছে বলে অনেকে সমালোচনা করেন।

আয়কর ব্যবস্থার মতো ভ্যাট ব্যবস্থাও এখানে অর্থনীতির অপ্রাতিষ্ঠানিক জগতের সবলদেব করের আওতায় আনতে পারছে কম। অপ্রাতিষ্ঠানিক সরবরাহকারীদের অনেকে শত শত পণ্যে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে নগদ লেনদেনের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আয় করছে। করের আওতায় আনা হচ্ছে না তাদের। কিন্তু উৎপাদক ও ভোক্তা

পর্যায়ে মূলক বেড়ে চলেছে। এই অবস্থার উন্নয়নে লেনদেন বাধ্যতামূলকভাবে ডিজিটাল মাধ্যমের আওতায় আনা দরকার। তাতে করের আওতা সম্প্রসারিত হবে। তবে করের আওতা বাড়ানোর কর্মসূচি মধ্যবিত্ত পরিশ্রমী উদ্যোক্তাদের জন্য যেন কর সন্তোষের রূপ না নেয়। যেসব কর্মকাণ্ডে অধিক কর্মসংস্থান হয় সেগুলোতে কর বা ভ্যাটের চাপ কম থাকাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ন্যায্য।



কর দেয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ানো যায়

২০২৪ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, এখানে টিআইএনধারী আছেন ১ কোটি ২০ লাখ ৮৯ হাজার জন। যদিও ঐ বছর রিটার্ন দাখিল করে কমবেশি মাত্র ৩৬ লাখ টিআইএনধারী।

রিটার্ন দাখিলকারীরা সবাই কর দেন না। যারা প্রকৃতই কর দেন তাদের মাঝে সরকারি কর্মচারীরা প্রধান গোষ্ঠী। প্রকৃতই কিছু কর দেন এমন রিটার্ন দাখিলকারীর সংখ্যা বাংলাদেশে ১৮ লাখ বা কমবেশি তার কাছাকাছি বলে অনুমান করা হয়। এই করদাতাদের থেকে সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের বাদ দিলে বাংলাদেশে আয়কর দেয়া মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮-১০ লাখ মাত্র। অথচ দেশে জনসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। এর পাঁচ শতাংশও কর দেয়ার যোগ্য হলে ৮০-৯০ লাখের কর দেয়ার কথা এখানে।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দাবি করেছিল, ‘দেশে ধনী

ও উচ্চমধ্যবিত্তদের ৮৭ শতাংশই উচ্চমধ্যবিত্তদের ৮৭ শতাংশই আয়-কর দেন না।' অপ্রাতিষ্ঠানিক জগতের অনেকেও লাইসেন্স বা নিবন্ধন না নিয়ে করের আওতার বাইরে থাকতে পারছে।

তবে, ইতিমধ্যে রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থা যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তার শ্রেণিগত যৌক্তিকীকরণ প্রয়োজন। প্রতীকীভাবে বললে, রেস্টোরাই যদি ভ্যাট বসে তাহলে এসি রেস্টোরা ও নন-এসি রেস্টোরার ভ্যাট ভিন্ন হওয়া দরকার। কারণ উভয়ের ভোক্তা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির নাগরিক।

বাংলাদেশকে এমন পদ্ধতি খুঁজতে হবে যাতে-যাদের আয় কম তাদের উপর কম কর ধার্য হবে এবং যাদের আয় যত বেশি তাদের উপর তত বেশি কর ধার্য হবে। এরকম মডেল একদিকে যেমন যৌক্তিক, অন্যদিকে তার মাধ্যমেই কেবল বৈষম্যবিরোধী উন্নয়ন কাজের জন্য বাড়তি তহবিল যোগাড় সম্ভব। গড় সিস্টেমে সকলের উপর একই হারে ভ্যাট আরোপের বিকল্প দরকার।

আয়ের স্তর বিবেচনায় না নিয়ে গড়ে একই হারে রাজস্ব দাবি ধার্য হলে তাতে কম আয়ের মানুষের আয়ের যতটুকু অংশ কর হিসেবে চলে যায়, ধনাঢ্যদের যায় তার চেয়ে বহু কম অংশ। একইভাবে কর ধার্য হওয়া উচিত অনেক স্তরে। নিচের দিকে করছাড় দিয়ে উপরের দিকে হার বাড়ানো দরকার।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদে কর আরোপের সুযোগ আছে

সম্পদকর ও বিলাসী জিনিসপত্রের উপর বিশেষ করণ এরকম প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বর্তমানে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে নিট সম্পদের দাম চার কোটি টাকা অতিক্রম করলে সারচার্জ দিতে হয়। বড় আয়তনের সম্পদের উপর সরাসরি করারোপের বিষয় বিবেচনা করা যায়। এখন সারচার্জ যে সম্পদের আয়কে ঘিরে হয় তার হিসাব করবর্ষের বাজার দরে হয় না। যেমন, আট হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাটের উপর সারচার্জ আছে। এরকম ফ্ল্যাটের

দরবিবরণী হচ্ছে বহু যুগ আগের ক্রয়কালীন হিসাবে। একাধিক গাড়ী থাকলেও সারচার্জ ধার্য হওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেকে দ্বিতীয় গাড়ি পরিবারের অপর কারো নামে নথিভুক্ত করেন।

সারচার্জ বিধানের সংস্কারের মতোই আরেকটি কর্মসূচি হতে পারে উত্তরাধিকারে পাওয়া সম্পদের উপর করারোপ। যেখানে পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত আয়ে কর দিতে হচ্ছে সেখানে বিনা পরিশ্রমে মৃত পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদে কর না থাকা গুরুতর অসাম্য। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদে কর না থাকা সম্পদ অর্জনে মেধা ও পরিশ্রমের ভূমিকাকে নিরুৎসাহিত করে। বিশ্বের বহু দেশে এই কর রয়েছে।

করারোপের এরকম সুযোগগুলোকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের রাজস্ব বাড়ানো যায়। উচ্চ আয় থেকে উচ্চ হারে কর আদায় হলে কর ব্যবস্থার নৈতিক দিক শক্তিশালী হয়। বর্তমান আয়কর নিয়মের শেষ স্তর ৩৫ লাখ ৭৫ হাজার লাখ টাকা পেরোলে পরবর্তী আয়ে যে কাউকে ৩০ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। এরকম ক্ষেত্রে একজন লোক যদি বছরে ৪০ লাখ টাকা আয় করে এবং অপরজন ৪০ কোটি টাকা আয় করে তাদের উভয়কে যদি সমান ৩০ শতাংশ হারে কর দিতে হয় তাহলে প্রথম জনের ২৮ লাখ টাকা অবশিষ্ট থাকবে, আর দ্বিতীয়জনের থাকবে ২৮ কোটি। একই নিয়ম ও একই হার বহাল থাকলে তাদের উভয়ের আয়

ও সম্পদ বৈষম্যের এই ব্যবধান পরেও বহাল থাকবে এবং বাড়বে। কিন্তু যদি প্রথম জনের জন্য আয়কর ৩০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় জনের জন্য ৫০ শতাংশ করা হয় তাহলে ধীরে হলেও কিছুটা আয় সমতা আসতে শুরু করবে।

এরকম বিবিধ উপায়ে কর সংস্কার দু'ভাবে সমাজে সমতা বাড়ায়। প্রথমত, কর আদায় প্রক্রিয়া সেখানে এক ধরনের সমতামুখিতা অবস্থা তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, বাড়তি কর বিনিয়োগে সমাজে বৈষম্য কমানোর মাধ্যমে নতুন পুঁজি ও নতুন ক্রেতাগোষ্ঠী তৈরি হয়। নতুন ক্রেতা-ভোক্তা গোষ্ঠী সমাজে পণ্য চাহিদা ও ভোগ বাড়ায়। তাতে অর্থনীতিতে বাড়তি গতি আসে এবং বাড়তি কর আহরণের জায়গা তৈরি হয়। কিন্তু এরকম না ঘটে যদি বৈষম্যই চলতে থাকে এবং বাড়তে থাকে তাহলে কী অবস্থা তৈরি হয় তার নজির ২০২২ সালের শ্রীলঙ্কা, ২০২৪ সালের বাংলাদেশে এবং ২০২৫ সালের নেপাল।

অর্থনৈতিক সুশাসনের জন্য

ব্যয়নীতির অগ্রাধিকার বদলাতে হবে

অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এও মনে রাখা জরুরি- কর ব্যবস্থার সংস্কার হলে বা সংস্কার হয়ে বাড়তি রাজস্ব আদায় হলেই সমাজে বৈষম্য কমে না। মানুষ যে কর দিতে নিরুৎসাহী সেটা এ কারণে যে, কর হার ক্রমাগত বাড়লেও সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনরা তা থেকে প্রত্যাশা



মতো সুফল পাচ্ছে না, সহায়তা পাচ্ছে না। তাছাড়া নাগরিকদের যদি পণ্য চলাচলে ও সেবাপ্রদান কাজে বর্তমানের মতো ব্যাপক চাঁদা ও ঘুষ দিয়ে যেতে হয় তাহলে বাড়তি কর, সারচার্জ কোথা থেকে দেবেন বা কেন দেবেন তাঁরা? যেসব উৎপাদনমুখী কারখানায় নিয়মিত গ্যাস থাকে না সেই শিল্প মালিকদের কাছে কোন মুখে কর চাইবে সরকার?

তার মানে, প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স রিফর্মের সঙ্গে সঙ্গে সুশাসন ও প্রগ্রেসিভ ব্যয়নীতি লাগবে। যেমন, সরকার অর্থ অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে যাদের একাধিক গাড়ি রয়েছে তাদের দ্বিতীয় গাড়ির জন্য ২৫ হাজার টাকা পরিবেশ সারচার্জ ধরেছে।

রাজস্ব আহরণের জন্য এটা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এই রাজস্ব কীভাবে, কোথায় খরচ হবে? পরিবেশ সারচার্জ হিসেবে পাওয়া অর্থ পরিবেশ সুরক্ষামুখী কোনো কাজে খরচ হবে কি না? প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স রিফর্ম এভাবেই প্রগ্রেসিভ বিনিয়োগ প্রণেলের সঙ্গে যুক্ত।

বাংলাদেশে ক্রমে কর আওতা বাড়লেও বৈষম্য লাঘবকারী ব্যয়নীতির বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা পাওয়া যায় না। বাড়তি রাজস্বকে সঠিকভাবে খরচ করার বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে এমপি ও রাজনীতিবিদদের।

প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স সিস্টেমের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ করে সেটা ঢাকার গুলশান-বনানী-বারিধারার মানুষদের জন্য আরও কয়েকটি ফ্লাইওভার তৈরিতে বা ধনী সমাজমুখী প্রকল্পে ব্যয় করলে সামাজিক বৈষম্য কমবে না। বাড়তি রাজস্ব ব্যয়ের অগ্রাধিকার নতুন করে ঠিক করতে হবে বাংলাদেশকে।

সম্ভাব্য এই ব্যয়নীতির মূলে থাকবে এমনসব কার্ঠামোগত উদ্যোগ যা দেশব্যাপী গরীব ও সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে সম্পদের স্থানান্তর ও পুনর্বণ্টন ঘটাবে। ৮০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে কেবল সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো নাকি তার একাংশ আলু-পেঁয়াজ-সরিষা চাষীদেরও দিবো সে বিষয়ে পুনর্ভাবনা জরুরি।

প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

সমকালীন বাংলাদেশে একটা বড় বিনিয়োগ ঢাকার মেট্রোরেল। এর প্রথম লাইনে খরচ ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। এই অর্থে দেশের সকলের হিস্যা আছে। এই প্রকল্পে অবশ্যই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি বেড়েছে। কিন্তু তার সুবিধাভোগী মূলত ঢাকার মানুষ। এরকম অধিকাংশ প্রকল্প ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো বড় বড় শহরকেন্দ্রিক হলে প্রান্তিক জেলাগুলোতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ করার সম্পদ আসবে কোথা থেকে?

ঢাকা ও চট্টগ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়নের পক্ষে প্রভাবশালীদের পক্ষপাত তীব্র থাকে। ফলে প্রগ্রেসিভ ব্যয়নীতি গুরুত্ব পাচ্ছে কম। মেট্রোরেল ছাড়াও এজপ্রসওয়ে, নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল ইত্যাদি বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্প হচ্ছে মূলত শহরাঞ্চলে। এই ধারা বদলিয়ে প্রান্তিক জেলাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাতে গ্রাম-শহর উন্নয়ন বঞ্চিত কিছুটা কমবে।

গ্রামমুখী নতুন ব্যয়নীতিতে থাকতে পারে প্রান্তিক জনপদে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো, সমাজকল্যাণধর্মী কর্মসূচি বাড়ানো, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষকদের বীজ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে ভর্তুকি দেয়া, জৈব কৃষিকে প্রণোদনা দেয়া ইত্যাদি। এসবই করতে হবে স্থানীয় সরকারকে সঙ্গে নিয়ে, তাকে শক্তিশালী করে, তার হাত দিয়ে।

দক্ষিণ এশিয়ায় প্রগ্রেসিভ ব্যয়নীতির নজরকাড়া এক উদাহরণ তৈরি করেছিল দিল্লীতে আম-আদমি পার্টি দরিদ্রমুখী স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে। ক্ষমতায় থাকাকালে তারা দরিদ্র এলাকাগুলোতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য এক ধরনের ক্লিনিক চালু করে। যাকে তারা বলছিল মহল্লা ক্লিনিক। নিত্যদিন হরেক ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হতো এসব ক্লিনিকে। এগুলো শহুরে দরিদ্রদের চিকিৎসা খরচ অনেক কমিয়ে ফেলে— যা পরোক্ষে তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো করে।

মহল্লা ক্লিনিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিনামূল্যে ছিল। সেকারণে মানুষ ঘনঘন তাতে যেতো। এতে কারো স্বাস্থ্য সমস্যা হলে প্রাথমিক পর্যায়েই সেটা জানা যেতো এবং তারা অল্প চিকিৎসায় রোগমুক্ত থাকতো। এছাড়া রাজ্য সরকার বাছাই করা কিছু ক্লিনিকে দরিদ্রদের জন্য প্রায় ২০০ ধরনের প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা করে। তারা এক ধরনের পলিক্লিনিকও খোলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাছে দরিদ্র রোগীদের পরামর্শের জন্য। তাদের আরেকটা সংস্কার ছিল রাষ্ট্রীয় হাসপাতাল থেকে সুপারিশকৃত রোগীদের সরকারি খরচে প্রাইভেট হাসপাতালে অপারেশন করার ব্যবস্থা। এই কর্মসূচিতে ৪১টি প্রাইভেট হাসপাতালকে যুক্ত করেছিল তারা। এসবে তারা ব্যাপক বিনিয়োগ করে। বিজেপি তাদের ক্ষমতায় টিকতে দেয়নি।

অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য দরকার নতুন রাজনৈতিক শক্তি

দরিদ্র সমাজ লক্ষ্য করে সম্পদ স্থানান্তর বা সম্পদ পুনর্বণ্টনের যেকোনো উদ্যোগ অর্থনৈতিক শ্রেণিগতের মতো। এরকম কর সংস্কার বাধা পাবে। সেই বাধা সরাতে এবং এর মাধ্যমে আহরিত সম্পদের অ-ধনীমুখী বিনিয়োগে ব্যাপক জনতার সমর্থন প্রয়োজন। কোটিপতি রাজনীতিবিদরা এরকম অর্থনৈতিক নীতির পক্ষে জনতাকে সমবেত করতে চাইবেন বলে ভরসা পাওয়া যায় না। ফলে সম্পদ পুনঃবণ্টনমূলক অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে নতুন রাজনৈতিক শক্তি-সমাবেশ প্রয়োজন বাংলাদেশে।

আলতাফ পারভেজ

গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
altafparvez@yahoo.com



বাংলাদেশে দলিত নারীদের জেভার সমতা ও ক্ষমতায়ন: একটি কাঠামোগত পর্যালোচনা

বাসন্তি সাহা

কেমন আছে দলিত নারীরা?

‘দলিত কলোনিগুলোতে মেয়েদের জন্মই হয় বিয়ে হওয়ার জন্য, বাচ্চা হওয়ার জন্য। মেয়েরা প্রাইমারি গন্ডি পেরোলেই বিয়ে দিতে হয় তাদের। আমার যখন ২৩ বছর বয়সে বিয়ে হয়, তখন আমি ছিলাম গনকটুলি কলোনির সবচেয়ে ‘বুড়ো মেয়ে’। আমি যাদের পড়াশুনা তাদেরও অনেকের তখন বিয়ে হয়ে গেছে’ কথাগুলো বলছিলেন করুণা রাণী দাস।

বিয়ের পর মিরপুর রবিদাস পাড়ায় থাকেন করুণা। ইডেন কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করা করুণা বলেন, বিয়ের পর একবছর দেরি হয়েছিল বাচ্চা হতে, তখনই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলতে শুরু করেছিল

বয়স্ক মেয়ে, লেখাপড়া জানা মেয়ে বাচ্চা হবে না। তারপর দুইবাচ্চার মা হয়ে চাকুরি ছেড়ে সংসারি হয়েছেন করুণা। লেখাপড়া শিখে ঘরে চৌকাঠ পেরোনোর যে সূচনা করেছিলেন, সেই চৌকাঠেই আটকে আছেন এখনও।

‘জীবনে একটা দিনও মনে করতে পারি না যেদিন পরিবারে, কলোনিতে বা বাইরে খারাপ কথা শুনতে হয়নি। জীবনে কোনোদিন স্কুলে যেতে পারিনি। একটা শব্দও লিখতে পারি না। কিন্তু আজ খুব ইচ্ছে করে পড়তে, লিখতে। আমার মতো আরও নারী আছেন আমাদের কলোনিতে যারা আজ লেখাপড়া শিখতে চায়’। কথাগুলো চিটাগাং রোডের, সিটি কলোনির সুমিতা রাণীর। যুগ যুগ ধরে জাত-পাত অস্পৃশ্যতার কাছে হেরে যাওয়া মানুষদের

একজন সে। জন্ম ও পেশাগত কারণে বৈষম্যে ও অস্পৃশ্যতার শিকার জনগোষ্ঠী দলিত হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে এই জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬৫ লাখের মতো। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক মানুষ দলিত নারী যারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে দলিত সমাজের মধ্যেও সবচেয়ে কম সুযোগ পেয়ে নিম্নস্তরে বসবাস করছে। ফলে তারা একজন দলিত পুরুষের তুলনায় অধিকতর সংহিসতা ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পদে মালিকানা না থাকা তাকে একেবারে প্রান্তিক করে ফেলেছে ফলে সে বাইরের সমাজে অস্পৃশ্য ও নিজেদের সমাজেও অধিকারহীন, ক্ষমতাহীন নারী, বিয়ে আর সম্ভান উৎপাদনই যার অমোঘ পরিণতি।



দলিত নারীদের বঞ্চনার প্রধান ক্ষেত্র

সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছোঁয়ায় মানুষের জীবনমান উন্নত হয়েছে। শিক্ষার বিস্তারও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু কুসংস্কার, কুপমণ্ডকতা কমেনি। ধর্মাত্মতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবিদ্বেষও কমছে না। কিছু কিছু প্রথাগত ও কাঠামোগত বঞ্চনার কারণে দলিতরা উপেক্ষিত হয়েই থাকছে। যেমন-

সমাজের প্রথাগত অস্পৃশ্যতার ধারণা

জাতপাত নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার কারণে দলিত নারীরা দলিত কলোনিগুলোতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন জীবন কাটায় কারণ মূলস্রোতের মানুষরা তাদের অস্পৃশ্য বলে মনে করে। সমাজের মূলস্রোতের মানুষের কোনো উৎসব পার্বণে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না। সমাজের এই ব্যবস্থা যেমন তাদের রাষ্ট্রীয় সকল সুবিধার বাইরে রাখে তেমনিভাবে এটা মানুষ হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকারকে খর্ব করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল অধিকার থেকে যুগের পর যুগ বঞ্চিত থাকার ফলে দলিত নারীদের অশিক্ষা, অপুষ্টি, বাল্যবিবাহ ও নানারকম পারিবারিক কুসংস্কার ঘিরে রাখে, যা দলিত নারীদের দলিত হিসেবে ও নারী হিসেবে দুভাবে বঞ্চিত করে।

জাত-পাতভিত্তিক পেশা ও পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, মূল্যবোধ ও জেভার ভূমিকা

জাত-পাতভিত্তিক পেশার কারণে দলিত নারীদের এই পেশার বাইরে কাজ করার সুযোগ কম। ফলে তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের আয়ের উপর নির্ভরশীল থাকে। এমনকি উপার্জনকারী নারীকেও তাদের উপার্জনের টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গভি পেরোলেই বিয়ে, তারপর সন্তান, তাদের লালনপালন, ঘরের কাজ করতেই তাদের জীবন কেটে যায়। পারিবারিক সংহিসতার কোনো ঘটনা ঘটলেও তারা মুখ খোলে না। ফলে দলিত নারীদের উপর সহিংসতা, যৌতুকের কারণে নির্যাতন বেড়েই চলছে। এর প্রতিকারের জন্য পঞ্চগণ্যেতের কাছে অভিযোগ করলেও তারা ন্যায্যবিচার পান না। সেই স্বামীর সাথেই সংসার করতে হবে মনে করে নারীরা অভিযোগও করেন না বেশিরভাগ সময়। এমনকি প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা থেকেও তারা বঞ্চিত হন।



পেশাগত ও সামাজিক বঞ্চনা

দলিত নারী যারা বাইরে কাজ করেন তারাও সাধারণত চা-শ্রমিক বা পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করেন, কাজগুলোতে সামান্য মজুরি, পেশা পরির্তনের সুযোগ নেই এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে দলিত নারী কর্মজীবী হলেও তার বঞ্চনা বা দুর্ভোগ কমে না। যদিও গত একদশকে সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে কিছু দলিত নারী সেলাই, বক বাটিক, বেকারি পণ্য তৈরি ও পার্লারে কাজ করার প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু সেটাও বেশিরভাগ নিজেদের কমিউনিটির মানুষের মধ্যেই কাজ করছেন। সামাজিক ট্যাবুর কারণে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ তাদের কাজগুলোকে সেভাবে এখনও গ্রহণ করতে চায় না।

বহুমাত্রিক দারিদ্র, অপুষ্টি, বাল্যবিবাহ

দলিত নারীদের দারিদ্র বহুমাত্রিক। একটা হচ্ছে নিজের কোনো আয় না থাকার কারণে দরিদ্র, অধিকার ভোগ করতে না পারার কারণে দরিদ্র আর সংসারে বা নিজের জীবনের উপরেও কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে দরিদ্র। এমনকি প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা

থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে। মা ও শিশু ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালগুলোতে যদিও সকলের জন্য সমান স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার রয়েছে কিন্তু সেখানেও এই নারীরা যেতে পারে না। যেতে পারে না দুটো কারণে, পরিবারের পুরুষ সদস্যরা নারীর স্বাস্থ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করে এবং হাসপাতাল বা ক্লিনিকের ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীদের অসহযোগিতা ও আচরণ তাদের সেবার জন্য যেতে নিরুৎসাহিত করে।

অশিক্ষা ও তথ্যে প্রবেশাধিকার না থাকা

দলিত নারীরা দরিদ্র ও বিচ্ছিন্নভাবে কলোনিতে থাকে। বাইরের পৃথিবীতে যৌন হয়রানি ও সাইবার ক্রাইমের মতো ঘটনা ঘটছে বলে অভিভাবকরা দলিত মেয়েশিশুদের স্কুলে পাঠাতে শঙ্কা বোধ করেন। ফলে এই সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা ৭৬ ভাগ মেয়েরই আঠার বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়।

এছাড়া দলিত মেয়ে যারা স্কুলে যাচ্ছে তারাও কখনো সহপাঠী ও শিক্ষকদের এমন আচরণের শিকার হয় যে তারা আর স্কুলে যেতে চায় না। এছাড়া স্কুলের পড়া বাড়িতে পড়ানো ও প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করতে না পারার কারণেও দলিত মেয়েরা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে।

ঢাকা শহরের দলিত কলোনিগুলোর মেয়েরা সাধারণত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য যায়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ পাওয়া কঠিন হয় আবার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ব্যয়বহুল ও দূরে হওয়ার কারণেও অভিভাবকরা মেয়েশিশুদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান না। ফলে প্রাথমিক এর পর তাদের লেখাপড়া একরকম বন্ধই হয়ে যায়। এছাড়া দলিত সম্প্রদায়ের একটা অংশের ভাষা বাংলা নয়, তাদের অনেকের ভাষা তেলেগু, হিন্দি, ভোজপুরী ও নাগরী। নিজেদের ভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ না থাকার কারণেও তারা পিছিয়ে থাকে।

অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার ঘাটতি

শহরাঞ্চলে দলিত কলোনিগুলোতে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নেই। পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। একটি টয়লেট ও গোসলখানা ৪/৫টি পরিবারকে ব্যবহার করতে হয়। এই সমস্যার মূল ভূজোভোগী হলো নারী কারণ প্রতিদিনের রান্না, অন্যান্য গৃহস্থালি কাজের প্রয়োজনীয় পানি ও খাবার পানি নারীকেই সংগ্রহ করতে হয়। অধিকাংশ দলিত কলোনিগুলোতে নারী-পুরুষকে একসাথে খোলা জায়গায় গোসল করতে হয়। এছাড়া নগরাঞ্চলের বাইরে চা-বাগানসহ গ্রামীণ দলিত কলোনিগুলোতে নদী ও পুকুর ছাড়া গোসলের কোনো ব্যবস্থাই নেই। কারণ দলিত জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষই রাস্তার পাশে বা বস্তিতে বসবাস করে।

সম্পদে মালিকানা না থাকা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ও সম্পদে দলিত নারীর মালিকানা না থাকার কারণে দলিত নারী ও কিশোরীরা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মতামত দ্বারা পরিচালিত হয়। নিজেদের কোনো কিছুতেই তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকে না। বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ না থাকার কারণে অনেক নারীকে দিনের পর দিন স্বামীর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। কোনো কারণে স্বামী পরিত্যক্ত হলে তাদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। দলিত সমাজে সম্পদে নারীর কোনো অধিকার নেই। হিন্দুরীতি

অনুযায়ী তাদের সম্পত্তি বন্টন হয়। দলিত সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রথাগত পদ্ধতিতে ব্যবস্থায়ও দলিত নারীর অংশগ্রহণ নেই। এমনকি নারীর প্রতি কোনো সহিংসতা হলেও সালিশি তাদের মতামত নেয়া হয় না।

বাংলাদেশে দলিত নারীদের জন্য সরকারি উদ্যোগ কী আছে?

বাংলাদেশ এর সংবিধান অনুযায়ী “ধর্ম, বর্ণ, জাত/জন্মস্থান বা লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো নাগরিককে বৈষম্যের শিকার হতে দেওয়া যাবে না” সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ (১) এ বলা আছে। সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৮ (৪) এ ‘দেশের পিছিয়ে পড়া অংশের নাগরিকদের উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ বিধান’ করার কথা বলা আছে।

এছাড়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তিতে International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) এ সই করেছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলো পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বা নারী ও যুবদের সামাজিক নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ ও অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করেছে। কিন্তু দলিত নারীদের বা দলিত বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এক একভাবে নির্ধারিত প্রকল্প নেই অর্থাৎ “প্রান্তিক জনগোষ্ঠী” ভিত্তিক বা অন্তর্ভুক্তিমূলক



প্রকল্পের মধ্যে দলিত সম্প্রদায়ও রয়েছে বলেই ধরে নিতে হচ্ছে।

সমাজ সেবা অধিদপ্তর এর বিধবা ও স্বামী কর্তৃক নিগৃহীত নারী, অবহেলিত, দুস্থ ও বেকারদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো থেকে কিছু দলিত নারী ভাতা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু শুধু দলিত সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সুনির্দিষ্টভাবে নেই। এছাড়া এসব প্রকল্পসমূহে কতজন দলিত বা হরিজন সম্প্রদায় উপকৃত হয়েছে, সেই বিষয়ে স্পষ্টভাবে তথ্য নেই। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি (targeted inclusion) নেই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ২০২২ সালে বৈষম্য বিরোধী বিল' সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা এখনও চূড়ান্তভাবে পাশ হয়নি।

সাসটেইনএবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কী?

বৈশ্বিক উন্নয়ন, দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্তি, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘের নেতৃত্বে ২০০০ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালে আরও ব্যাপকভিত্তিক টেকসই উন্নয়ন ও কার্যকর কার্যামোগত পরিকল্পনার লক্ষ্য নিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে কিছু লক্ষ্য ধাপে ধাপে অর্জনের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনএবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি ঘোষণা করে।

টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে, যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোনো ব্যক্তি, কোনো গোষ্ঠী, কোনো প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সে উন্নয়ন প্রক্রিয়াই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য নয়, সকল বয়স্ক, পিছিয়ে থাকা, বাদ পড়া সব জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি সুসম উন্নয়ন পরিকল্পনাই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা



৫ হচ্ছে-জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

অভীষ্ট ৫ এর লক্ষ্যমাত্রা

- ৫.১ সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো;
- ৫.২ পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরে বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান;
- ৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসান;
- ৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যা কার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং বাসা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা;

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;

৫.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এদের পর্যালোচনামূলক সম্মেলনসমূহের ফলাফল-দলিলের আলোকে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

৫.ক বিদ্যমান জাতীয় আইনকানূনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন;

৫.খ নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ

প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো;

৫.গ সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা।

কেন এসডিজি বাস্তবায়নে দলিত নারীরা বাইরে রয়ে গেছে?

বাংলাদেশ সমাজের মূলস্রোতের মানুষকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমাজের একটি অংশ দলিত নারীদের বাদ রেখে এই উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। কারণ-

- রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দলিত নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত, শিক্ষা ও তথ্যে অভিজ্ঞতা কম থাকা;
- দলিত নারীদের নিয়ে আলাদা কোনো পরিসংখ্যান নেই;
- বঞ্চনার বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার পাওয়ার কাঠামোও নেই বললেই চলে;
- শিক্ষা ও দারিদ্রের কারণে দলিত নারীরা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দৃশ্যমান নয়।

করণীয়

দলিত নারী ও মেয়েশিশুদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কিছু উদ্যোগ তাদের জীবনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। যেমন,

- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের ১ নং ও ২ নং ধারা অনুযায়ী সমাজে নারীর প্রতি বিদ্যমান সকল আইন ধারা বিলোপ করে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

- হিন্দু বিবাহ বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন করাসহ তালাক, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বন্টন সংক্রান্ত সকল আইনে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক অংশগুলোকে বাদ দিতে হবে;
- নারী উন্নয়ন নীতিমালা -২০১১ এ দলিত নারী, কিশোরী ও অন্যান্য অন্যান্য বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নারীদের বিশেষ চাহিদার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এই দলিত জনগোষ্ঠীর নারীদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা;
- জাতপাতভিত্তিক প্রচলিত ধারণা ও বৈষম্য নিরসনে সরকারকে স্কুল, গণমাধ্যম, কমিউনিটি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে;
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ ও অন্যান্য সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত মানুষের মজুরিবৃদ্ধিসহ তাদের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
- তথ্য ও ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে দলিত নারীর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে;
- দলিত নারীদের বাল্যবিবাহ, শিক্ষায় ঝড়েপড়া প্রতিরোধে বিশেষ শিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করা;
- সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রতি তিনমাস পর পর দলিত নারীদের স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য দেয়ার জন্য হেলথ ক্যাম্প করা;
- পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সহিংসতা প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য অভিযোগ ব্যবস্থা চালু করা;
- স্থানীয় সরকার ও জাতীয় পর্যায়ে দলিত নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির জন্য বিশেষ কোটার সুবিধা রাখা।

বাংলাদেশের দলিত নারীরা পিছিয়ে থাকা নয়, পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠী। নেতৃত্বের অভাব, দারিদ্র, শিক্ষা, সচেতনতা, সুযোগ ও সম্পদের অভাব যুগ যুগ ধরে এই জনগোষ্ঠীর নারীদের উন্নয়নের বাইরে রেখেছে। কিন্তু এইসব মানুষের উন্নয়ন, সুস্থ, শোভন জীবন যাপন ও টেকসই উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র, উন্নত দেশ, প্রতিষ্ঠান ও জাতিসংঘের উপর। কারণ বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবাই অংশীজন: কাউকে পেছনে ফেলে যাওয়া নয়।

বাসন্তি সাহা

কান্ট্রি ফোকাল পয়েন্ট- বাংলাদেশ
এশিয়া দলিত রাইটস ফোরাম।
basantitaposh@gmail.com



COP 30 পরবর্তী বাংলাদেশ: জলবায়ু ন্যায়বিচার ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংকট

মোহন রবিদাস

প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ব্যবধান

২০২৫ সালের ১০-২১ নভেম্বর ব্রাজিলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিত COP 30 সম্মেলন "বাস্তবায়নের COP" হিসেবে ঘোষণা করা হলেও বাস্তবতা হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এই সম্মেলন ছিল আশা এবং হতাশার মিশ্রণ। “বেলেম পলিটিক্যাল প্যাকেজ” নামক ২৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এর বাস্তবায়ন নিয়ে গভীর সংশয় রয়ে গেছে। মাত্র ০.৪৭ শতাংশ বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ করা বাংলাদেশ যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ মূল্য দিচ্ছে-১৮ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা, বাসস্থান, খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে-সেখানে COP 30-এর ফলাফল আমাদের মানবাধিকার রক্ষায় কতটা কার্যকর হবে সেই প্রশ্ন এখন অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত,

বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়, নদীভাঙা মানুষ, বেদে জনগোষ্ঠী, চর এলাকার বাসিন্দা, আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের মতো প্রান্তিক ও বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ক্রমবর্ধমান হারে ঘটছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন আরো তীব্র করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশগত সংকট নয়, এটি মৌলিক মানবাধিকারের সংকট- Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention on the Rights of the Child (CRC), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Ges International Convention on the Elimina-

tion of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)-এ স্বীকৃত অধিকারগুলো প্রতিদিন লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এই সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হওয়া সত্ত্বেও, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন অপরিপািত এবং কাঠামোগত বৈষম্য এই সংকটকে আরো গভীর করছে।

COP 30 সম্মেলন: কী পেলাম? কী পেলাম না?

COP 30 সম্মেলনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা কাগজে-কলমে ইতিবাচক, কিন্তু বাস্তবায়নের অনিশ্চয়তা এবং দুর্বল প্রতিশ্রুতি রয়ে গেছে। প্রথমত, অভিযোজন তহবিল (Adaptation Finance) ২০৩৫ সালের মধ্যে তিনগুণ বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে এটি আইনগতভাবে

বাধ্যতামূলক নয়, কোন সুনির্দিষ্ট ভিত্তিরেখা (baseline) নেই এবং ২০৩০-এর পরিবর্তে ২০৩৫ সালে স্থগিত করা হয়েছে। UN Environment Programme-এর হিসাব অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন তহবিল চাহিদা হবে বছরে ৩১০-৩৬৫ বিলিয়ন ডলার, যেখানে বর্তমানে প্রবাহ মাত্র ২৬ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয়ত, Belém Action Mechanism (BAM) নামে একটি “ন্যায্য রূপান্তর” (Just Transition) প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা হয়েছে যা জীবশা জ্বালানি থেকে সরে আসার সময় শ্রমিক ও সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলে, কিন্তু এতে অতিরিক্ত, অনুদান-ভিত্তিক অর্থায়নের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নেই। তৃতীয়ত, Global Goal on Adaptation-এর জন্য ৫৯টি সূচক গৃহীত হয়েছে যা অভিযোজন অগ্রগতি পরিমাপ করবে, কিন্তু এই সূচকগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে অপার্যাপ্ত এবং জাতি-ভিত্তিক, লিঙ্গ-ভিত্তিক ও শ্রেণি-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। চতুর্থত, “বাকু টু বেলেম রোডম্যাপ” অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বছরে ন্যূনতম ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০ বিলিয়ন ডলার হতে হবে উন্নত দেশগুলোর সরকারি অর্থায়ন-কিন্তু এই তহবিলের কতটা অনুদান এবং কতটা ঋণ হবে তা স্পষ্ট নয়।

সবচেয়ে বড় হতাশা হলো জীবশা জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার কোনো স্পষ্ট রোডম্যাপ বা সময়সীমা নেই-তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর বিরোধিতায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এর বদলে ব্রাজিলীয় প্রেসিডেন্সি স্বেচ্ছাভিত্তিক দুটি উদ্যোগ-“Belém Mission to 1.5°C” এবং “Global Implementation Accelerator”-চালু করেছে যা আনুষ্ঠানিক জাতিসংঘ প্রক্রিয়ার বাইরে এবং কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। Loss and Damage Fund-এর জন্য কোনো নতুন বা সুনির্দিষ্ট অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি আসেনি, যদিও এটি বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য সবচেয়ে জরুরি ছিল।

বাংলাদেশের জন্য COP 30-এর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো অভিযোজন তহবিলের স্বীকৃতি, কারণ আমাদের মতো দেশের জন্য অভিযোজন একটি অস্তিত্বের প্রশ্ন। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ তার দ্বিতীয় NDC (Nationally Determined Contribution) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অভিযোজন তহবিলের মাত্র ১ শতাংশ এবং প্রশমন তহবিলের ২.৩৫ শতাংশ পেয়েছে বিদেশী উৎস থেকে। বাংলাদেশ ২০২১-২০৩০ সময়কালে ২৩০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিলের প্রয়োজন চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু তার সামান্যই পাওয়া গেছে। যেহেতু বাংলাদেশকে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুবিধা জোরদার এবং জলবায়ু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন, তাই এই অপার্যাপ্ত তহবিল প্রবাহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমার্থক।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ

দলিত সম্প্রদায়: “অস্পৃশ্যতা” থেকে জলবায়ু বর্ণবাদ

বাংলাদেশে আনুমানিক ৬.৫ থেকে ৬.৮ মিলিয়ন দলিত জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা প্রধানত হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অংশ। এই জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বর্জনের শিকার-তাদের বেশিরভাগ অত্যন্ত দরিদ্র, নিরক্ষর, এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও জনসেবায় অত্যন্ত সীমিত প্রবেশাধিকার রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এই ঐতিহাসিক বৈষম্যকে আরো তীব্র করে তুলছে এবং নতুন ধরনের “জলবায়ু বর্ণবাদ” (Climate Casteism) তৈরি করছে।

Amnesty International-এর ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত প্রতিবেদন “Left Behind in the Storm: Dalit Women Sanitation Workers and the Fight for Water and Dignity” অনুযায়ী, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার দলিত নারী পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীরা নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পেতে বিশাল বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ত্রাণ কর্মসূচিতে তাদের বর্জন ও দুর্বলতা প্রকট। ঘূর্ণিঝড় রিমাল (২০২৪)-এর পর, খুলনা ও সাতক্ষীরায় সরকারি সহায়তা কর্মসূচি দলিতদের অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অন্তর্ভুক্তির বাধাগুলো-গভীর শিকড়যুক্ত ব্যবস্থাগত বর্ণ-ভিত্তিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, ভূমি দলিলের অনুপস্থিতি এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসতির অবস্থান-হিসাব করেনি।

খুলনা ও সাতক্ষীরার দলিত পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীরা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, খরা এবং বন্যার অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা নিম্নভূমি, বন্যাপ্রবণ এলাকায় বাস করেন।



তাদের বসতিগুলো সাধারণত প্রান্তিক জমিতে-নদীর ধারে, নিষ্কাশন খালের পাশে বা বন্যা-প্রবণ এলাকায়-যেখানে উচ্চ বর্ণের মানুষ বাস করতে চান না। জলবায়ু দুর্যোগের সময় তাদের ঘরবাড়ি প্রথম ডুবে যায় এবং শেষে পুনর্বাসন পায়। খুলনা ও সাতক্ষীরার পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীরা জানিয়েছেন তাদের বাড়িতে পানীয়, ধোয়া, রান্না ও পরিষ্কারের জন্য কোনো পানি সংযোগ নেই। বরং, অনেককে দূরবর্তী পরিশোধন কেন্দ্র থেকে পানি কিনে বহন করতে হয় অথবা বৃষ্টির পানি সংগ্রহ বা জনসাধারণের কূপ বা পুকুরের পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হন। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় পুকুর ও কূপের পানি পানযোগ্য নয়, কিন্তু দলিত নারীদের প্রায়শই স্থানীয় পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) কমিটি এবং রিভার্স-অসমোসিস ইউনিট, টিউবওয়েল ও সংরক্ষণ ট্যাঙ্কের স্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়।

বর্ণ ও লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের কারণে দলিত নারী পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীরা দ্বিগুণ শোষণের শিকার। তারা অত্যন্ত নিম্ন মজুরিতে দৈনিক ১৫০-৩০০ টাকা) অমানবিক কাজ করেন-হাত দিয়ে ময়লা পরিষ্কার, সেপটিক ট্যাঙ্ক খালি করা-কোনো সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা বেড়ে যাওয়ায় তাদের কাজের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু আয় বাড়েনি। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার পর সাইক্লোন শেল্টারে দলিতরা বর্ণ-ভিত্তিক বৈষম্যের মুখোমুখি হন যখন আশ্রয় বা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। দলিতদের আশ্রয়কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দিলেও প্রভাবশালী বর্ণের মানুষ তাদের নোংরা জায়গায় বসতে বাধ্য করে বা বলে, "তুমি দলিত এবং তুমি অস্পৃশ্য তাই তোমার উচিত নিজেকে আলাদা করা যাতে আশ্রয়কেন্দ্র পবিত্র থাকে"। অনেক দলিত নারী এই দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রে যৌন শোষণের ঝুঁকিতে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তন দলিত নারীদের আয় ও জীবিকা সংকুচিত করছে, বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়ছে, খাদ্য উৎস প্রভাবিত করছে এবং লিঙ্গ ও বর্ণ-ভিত্তিক বৈষম্যের ছেদবিন্দুতে মুখোমুখি অসমতা আরো গভীর



করছে। বৈশ্বিকভাবে ২৬০ মিলিয়নেরও বেশি দলিত মানুষ এই লুকানো বর্ণবাদের শিকার এবং জলবায়ু সংকট বৈশ্বিকভাবে প্রকাশ পেলেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আদিবাসী, নিম্ন-আয়ের পরিবার, রঙিন মানুষ এবং দলিতদের মতো ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠী সম্মুখসারির সম্প্রদায় যারা ক্ষতিকর জলবায়ু প্রভাব প্রথম এবং সবচেয়ে খারাপভাবে অনুভব করে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশের গ্রামীণ অভ্যন্তরভাগে পানি সংকটের মধ্যে 'পানি দাঙ্গা' ঘটছে-প্রভাবশালী উচ্চ বর্ণের নারীরা দলিত নারীদের সরকারি হ্যান্ড পাম্প ও কূপ ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। শারীরিক সহিংসতা এড়াতে দলিত নারীরা তাদের গ্রামের বাইরে এক কিলোমিটারেরও বেশি দূরে পানি সংগ্রহ করতে যাচ্ছে। এই অবস্থা বাংলাদেশেও বিদ্যমান-উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার কারণে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকটে দলিত নারীদের দিনে ৩-৪ ঘণ্টা পানি সংগ্রহে ব্যয় করতে হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সীমিত করে। বৈষম্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জলবায়ু দুর্বলতা বাড়ায়। প্রাতিষ্ঠানিক বাধা কার্যকর স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বাধা দেয়। দলিত সম্প্রদায়কে সরকারি নীতিতে "অদৃশ্য" রাখা হয়-এই কর্মীরা সরকারি জলবায়ু পরিবর্তন, পানি

ও স্যানিটেশন নীতিতে তাদের বর্ণ, লিঙ্গ ও পেশার কারণে মূলত অদৃশ্য, যদিও এই নীতিগুলোর দ্বারা তারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বর্ণ-ভিত্তিক বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে, বর্ণ-ভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পানি ও স্যানিটেশন পরিকল্পনা সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলিত নারীদের সারগর্ভ সমতা ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

বেদে সম্প্রদায়: নদীর সন্তান থেকে জলবায়ু উদ্ধাস্ত

বাংলাদেশের বেদে বা "নদী যাযাবর" সম্প্রদায় হলো একটি অনন্য যাযাবর জনগোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিকভাবে নৌকায় বাস করে এবং নদীতে ভেসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা করে জীবিকা নির্বাহ করে। আনুমানিক ০.৫ মিলিয়ন যাযাবর বেদে বাংলাদেশে বাস করে, যদিও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ৭৫,০০০-৮,০০,০০০-এর মধ্যে, যার মধ্যে ৯৫ শতাংশ শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং ৯৮ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। জলবায়ু পরিবর্তন এই সম্প্রদায়কে তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা

থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

জয়গুন বিবি একসময় নৌকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নদীকে কেন্দ্র করে তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন- তার চলাচল, রান্না এবং জীবিকা সবকিছু নদীকে ঘিরেই ছিল-তার বর্তমান দলের অনেক সদস্য কখনো নৌকা দেখেননি। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীকে শুকিয়ে ফেলেছে। পদ্মা, যমুনা, মেঘনার মতো বড় নদীগুলো প্রতি বছর হাজার হাজার হেক্টর প্লাবনভূমি ভাসিয়ে নিয়েছে, নদীভাঙন হাজার হাজার মানুষকে ভূমিহীন ও গৃহহীন করছে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা এবং অতিবৃষ্টি নদীর পানিপ্রবাহ পরিবর্তন করছে-কখনো নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, কখনো বিধ্বংসী বন্যা হচ্ছে।

বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ যারা মাছ ধরা, সাপ খেলা, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ছিল, তারা এখন নদী শুকিয়ে যাওয়ায় এবং মাছ কমে যাওয়ায় জীবিকা হারাচ্ছে। যাযাবর জীবনধারার কারণে, বেদে সম্প্রদায় বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি কল্যাণ প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে থাকে। ২০০৮ সালে তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হলেও তারা এখনো যথাযথ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার পায় না। তাদের ক্রমাগত চলাচলের কারণে শিশুদের স্থায়ীভাবে স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হয় না।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেদে সম্প্রদায় এখন বাধ্য হয়ে ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু সেখানে তারা চরম বৈষম্য ও প্রান্তিকতার শিকার হচ্ছে। তাদের কোনো ভূমি মালিকানা নেই, জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে সমস্যা হয়, এবং শহরের বস্তিতে অমানবিক পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। ঢাকার ৬০ শতাংশ জলাশয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। শহরের মাত্র ৪.৮ শতাংশ এলাকায় এখন অবশিষ্ট জলাশয় রয়েছে। শহরের সবুজ আচ্ছাদন ২১.৬ শতাংশ থেকে মাত্র ১১.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। তাছাড়া, বর্তমানে ঢাকায় এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে

থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে নদী ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বাসকারী বেদে সম্প্রদায় এই নতুন বাস্তবতায় কতটা বিদ্রান্ত ও বাস্তব্যত বোধ করছে তা সহজেই কল্পনা করা যায়।

বেদে সম্প্রদায়ের বাসস্থানের অধিকার, জীবিকার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অধিকার-সবকিছুই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে লঙ্ঘিত হচ্ছে। তারা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সেবা ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত, এবং তাদের অনন্য যাযাবর সংস্কৃতি ও পরিচয় বিলুপ্তির হুমকিতে।

চর এলাকার বাসিন্দা: ভূমি হারানোর অন্তহীন চক্র

বাংলাদেশের চর এলাকা (নদীর মাঝে বালুচরে সৃষ্ট দ্বীপ) অত্যন্ত উর্বর কিন্তু অত্যন্ত অস্থায়ী-নদীভাঙন ও পলি জমার কারণে এই চরগুলো তৈরি হয় এবং বিলীন হয়। এখানে বসবাসকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-যাদের বেশিরভাগ ভূমিহীন কৃষক, জেলে এবং দিনমজুর-জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমবর্ধমান নদীভাঙন, বন্যা এবং ফসলহানির শিকার হচ্ছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতি বছর নদীর দ্বীপ (চর) এলাকায় অনেক মানুষ বাস্তব্যত হচ্ছে। নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা-প্রতি বছর প্রধান নদীগুলো (পদ্মা, যমুনা, মেঘনা) কয়েক হাজার হেক্টর জমি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চর এলাকার বাসিন্দারা ক্রমাগত স্থানচ্যুতির একটি দুঃসংক্রান্ত আটকা পড়ে-একটি চর ভেঙে গেলে তারা নতুন চরে যায়, যা আবার কয়েক বছর পরে ভেঙে যায়।

ঘন ঘন বন্যা, নদীভাঙন এবং ফসলের ক্ষতি স্থানান্তরের প্রধান কারণ এবং নতুন বাসস্থানে সামাজিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়। চর এলাকার মানুষদের কোনো স্থায়ী ভূমি মালিকানা নেই, কোনো দলিল নেই, তাই সরকারি সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ পেতে অসুবিধা হয়। তারা স্থানীয় সরকার, ব্যাংক ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। “আমি একটি বাড়ি পুনর্নির্মাণ করতে

পারি, কিন্তু এটা কি আমার ঘর হবে? সেই সমস্ত স্মৃতি এবং সামাজিক বন্ধন! এখন আমি সবকিছু হারিয়েছি,” বলেন আবদুল, পাচ থাকুরিয়া, সিরাজগঞ্জের একজন সত্তরের মাঝামাঝি বয়সের কৃষক, যে এলাকা নদীভাঙনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বাস্তব্যুতি শুধু ভৌত সম্পদ হারানো নয়, এটি মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় হারানো। দারিদ্র্য বাস্তব্যুত সম্প্রদায় বা ব্যক্তিদের ওপর শারীরিক ও মানসিক চাপ তৈরি করে-প্রায়শই, স্থানান্তরের প্রক্রিয়ার চেয়ে বেশি। একটি অনিশ্চিত পরিবেশে বেঁচে থাকার চাপ সহ্য করা, বাড়ির শিকড়যুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির বিপরীতে, বাস্তব্যুত ব্যক্তিদের আবেগগতভাবে নিষ্কাশন করে।

চর এলাকার নারীদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। প্রায়শই গৃহকর্মী বা গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করার পাশাপাশি পরিবার লালনপালন করা, তারা প্রতিদিন যৌন ও অন্যান্য ধরনের সহিংসতার হুমকির সম্মুখীন হন, যা আঘাতমূলক। চর এলাকার শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে, স্কুলে যেতে পারে না, এবং শিশুশ্রমে বাধ্য হয়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী: প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ টি ভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.৮ শতাংশ, যাদের বেশিরভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং দূরবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। কয়েক দশক ধরে, গারো ও হাজং সম্প্রদায় পদ্ধতিগত বৈষম্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বর্জনের শিকার হয়েছে। ফলস্বরূপ, সম্প্রদায়গুলোর পক্ষে জনসাধারণের বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হওয়া, ন্যায়বিচার পাওয়া এবং ব্যবসায়িক ও জাতীয় নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করা কঠিন।

বাংলাদেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমির আনুষ্ঠানিক মালিকানা এখনো স্বীকৃত হয়নি। তাই, অনেক গারো ও হাজং তাদের শতাব্দী ধরে বসবাস করা ভূমির মালিকানা দাবি করতে পারে না। তাছাড়া, উন্নয়ন ও পর্যটন প্রচারের নামে ভূমি অধিগ্রহণ



তাদের অবস্থানকে আরো বিপন্ন করে। জলবায়ু পরিবর্তন এই প্রান্তিকতা আরো তীব্র করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। গত কয়েক দশকে, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, বন্যা, আকস্মিক বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরার মতো দ্রুত ও দীর্ঘ সূচনার ঘটনার তীব্রতা ও ঘনত্ব দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই নীতির অধিকাংশই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়, যেমন আদিবাসীদের (ওচ) অধিকার ও অভিযোজন অনুশীলন প্রচার করতে ব্যর্থ। আদিবাসী সম্প্রদায় প্রকৃতি-নির্ভর জীবিকার সাথে জড়িত-বন সংগ্রহ, ঝুঁকি চাষ, নদীতে মাছ ধরা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন উজাড়, বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও জীবিকা হুমকিতে ফেলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিধস বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আদিবাসী বসতি ধ্বংস করছে। উত্তরবঙ্গে খরা বাড়ছে, সমতলের আদিবাসীরা বন্যা ও নদীভাঙনের শিকার। আদিবাসী নারী ও শিশুরা অপুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবার অভাব এবং শিক্ষা থেকে

বঞ্চিত শিকার। তাদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-যা প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত-জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পালন করা কঠিন হচ্ছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু: দ্বিগুণ দুর্বলতা

বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সামাজিক বৈষম্য এবং জলবায়ু দুর্বলতা-উভয়ের শিকার। উপকূলীয় অঞ্চলে হিন্দু জেলে সম্প্রদায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান আদিবাসী সম্প্রদায় জলবায়ু দুর্ঘটনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ তারা প্রান্তিক এলাকায় বাস করে এবং সরকারি সহায়তায় অগ্রাধিকার কম পায়।

দুর্ঘটনায় সময় ত্রাণ বিতরণে সংখ্যালঘুদের প্রায়ই বৈষম্যের শিকার হতে হয়। ভূমি দখল এবং সম্পত্তি হরণের ঘটনা বেড়ে যায় যখন তারা দুর্ঘটনায় বাস্তুচ্যুত হয়। সংখ্যালঘু নারীরা যৌন সহিংসতার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে।

নারী: জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নারীদের

ওপর অসমভাবে পড়ে কারণ তারা কৃষি, পানি সংগ্রহ এবং পরিবার পরিচর্যার প্রধান দায়িত্বে থাকেন। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় সময় নারীদের মৃত্যুর পুরুষদের তুলনায় বেশি-১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে মৃতদের ৯০ শতাংশ ছিল নারী ও শিশু।

দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে নারীরা যৌন সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং পাচারের শিকার হন। জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করে, প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস করে এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বাড়ায়, পরিবারগুলোকে নেতিবাচক মোকাবিলা প্রক্রিয়ার দিকে চালিত করে-যার মধ্যে রয়েছে মেয়েদের স্কুল থেকে সরিয়ে নেওয়া, বাল্যবিবাহ এবং এমনকি মানব পাচার।

জলবায়ু-প্রভাবিত অভিবাসনে নারীরা আরো ঝুঁকিপূর্ণ-গৃহকর্মী বা গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে শহরে গিয়ে তারা শোষণ, কম মজুরি এবং অনিরাপদ কাজের পরিবেশের শিকার হন।

শিশু: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হারানো সুযোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩৬ শতাংশ শিশু স্ট্যান্ডিং-এ (বুদ্ধিজনিত সমস্যা) ভুগছে। বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের সময়

স্কুল বন্ধ থাকায় এবং পরিবার দারিদ্র্যের কারণে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়ার মতো জলবায়ু-সম্পর্কিত রোগে শিশু মৃত্যুহার বাড়ছে।

জলবায়ু-প্রভাবিত স্থানচ্যুতির কারণে শিশুরা মানসিক আঘাত, শিক্ষা বিচ্ছিন্নতা এবং শৈশব হারানোর শিকার হচ্ছে। Convention on the Rights of the Child (CRC) অনুযায়ী শিশুদের শিক্ষা, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার অধিকার রয়েছে, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এই সব অধিকার লঙ্ঘন করছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি: সবচেয়ে অরক্ষিত

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দুর্যোগের সময় সবচেয়ে অরক্ষিত-সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে রাস্প নেই, প্রাথমিক সতর্কীকরণ সাইন ভাষায় বা অডিও ফরম্যাটে নেই, উদ্ধার অভিযানে তাদের অবহেলা করা হয়। তারা ত্রাণ সংগ্রহে অক্ষম এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রায়ই অন্তর্ভুক্ত হয় না।

জলবায়ু-প্রভাবিত স্বাস্থ্য সংকট-তাপপ্রবাহ, রোগব্যাধি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যা আরো খারাপ করে। তাদের চলাচলের স্বাধীনতা, স্বাস্থ্যের অধিকার এবং মর্যাদার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।



বয়স্ক: সবচেয়ে উপেক্ষিত

বয়স্করা তাপপ্রবাহে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করেন। হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিসের মতো রোগে ভোগা বয়স্করা জলবায়ু-সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সংকটে আরো ঝুঁকিপূর্ণ। দুর্যোগের সময় তাদের নিজেদের রক্ষা করার শারীরিক সক্ষমতা কম থাকে। পরিবারের তরুণ সদস্যরা অভিবাসনে গেলে বয়স্করা একা পড়ে থাকেন এবং সহায়তাহীন হয়ে পড়েন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকারের যোগসূত্র: আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে

জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবাধিকারের মধ্যে যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও চুক্তিতে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ UDHR, ICESCR, ICCPR, CRC, CEDAW এবং ICERD-এ স্বাক্ষরকারী হওয়া সত্ত্বেও, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিম্নলিখিত অধিকারগুলো ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে:

জীবনের অধিকার (Right to Life): UDHR Article 3 এবং ICCPR Article 6-এ স্বীকৃত এই অধিকার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, তাপপ্রবাহ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির

কারণে হুমকির মুখে। বাংলাদেশে প্রতি বছর জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।

খাদ্যের অধিকার (Right to Food): ICESCR Article 11-এ স্বীকৃত এই অধিকার কৃষি উৎপাদন, হ্রাস, মৎস্য সম্পদ কমে যাওয়া এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে লঙ্ঘিত হচ্ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ ধান উৎপাদন ২০-৩০ শতাংশ কমতে পারে।

পানির অধিকার (Right to Water): ICESCR-এর সাথে সম্পর্কিত এই অধিকার লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া এবং পানি দূষণের কারণে লঙ্ঘিত হচ্ছে। উপকূলীয় ৪৫+ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। বাংলাদেশ ICESCR-এর অধীনে প্রান্তিক গোষ্ঠীর পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং ICERD-এর অধীনে কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে এবং সকল মানবাধিকারে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য।

বাসস্থানের অধিকার (Right to Housing): ICESCR Article 11-এ স্বীকৃত এই অধিকার নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার কারণে লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রতি বছর ১,৫০,০০০ মানুষ ভূমি হারাচ্ছে এবং বস্তিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে।

জীবিকার অধিকার (Right to Livelihood): ICESCR-এ স্বীকৃত এই অধিকার কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে লঙ্ঘিত হচ্ছে। কৃষক ও জেলেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা হারাচ্ছে।

স্বাস্থ্যের অধিকার (Right to Health): ICESCR Article 12-এ স্বীকৃত এই অধিকার ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, তাপঘাত এবং অপুষ্টির কারণে লঙ্ঘিত হচ্ছে। ২০২৩ সালে ৩,২১,০০০+ ডেঙ্গু আক্রান্ত এবং ১,৭০০+ মৃত্যু হয়েছে।

শিক্ষার অধিকার (Right to Education): CRC এবং ICESCR-এ স্বীকৃত এই অধিকার দুর্যোগের সময় স্কুল বন্ধ, পরিবার দারিদ্র্যের কারণে শিশুশ্রম এবং



বাল্যবিবাহের কারণে লক্ষিত হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights): ICESCR Article 15-এ স্বীকৃত এই অধিকার আদিবাসী ও বেদে সম্প্রদায়ের ভূমি ও ঐতিহ্য হারানোর কারণে লক্ষিত হচ্ছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right to Self-determination): ICCPR এবং ICESCR-এর Article 1-এ স্বীকৃত এই অধিকার জলবায়ু শরণার্থী হয়ে স্থানচ্যুতির কারণে লক্ষিত হচ্ছে। মানুষ তাদের জন্মভূমি ও সংস্কৃতি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

বৈষম্যহীনতার অধিকার (Right to Non-discrimination): ICERD এবং CEDAW অনুযায়ী জাতি, বর্ণ, লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ, কিন্তু জলবায়ু সংকটে দলিত, নারী, আদিবাসী প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সরকারি সহায়তায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

COP 30 পরবর্তী বাংলাদেশের দাবি: মানবাধিকার-ভিত্তিক জলবায়ু কর্ম

COP 30 সম্মেলনের ফলাফল যথেষ্ট নয়, তাই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংস্থা, UNFCCC, Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund, এবং উন্নত দেশগুলোর কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলো জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে:

০১ Loss and Damage Fund-এর তাৎক্ষণিক ও পর্যাপ্ত মূলধন: COP 27-এ প্রতিষ্ঠিত Loss and Damage Fund-এ এখনই কমপক্ষে ৪০-৫০ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক অর্থায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য সরলীকৃত ও দ্রুত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি (যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা) এবং আকস্মিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) উভয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নদীভাঙনে বছরে ১,৫০,০০০ মানুষ ভূমি হারাচ্ছে-এদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন জরুরি;

০২ অভিযোজন ও প্রশমন তহবিলে ৫০-৫০ বর্টন: বর্তমানে ৭৫ শতাংশ জলবায়ু তহবিল প্রশমনে ব্যয় হয়, কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অভিযোজন সবচেয়ে জরুরি। অভিযোজনে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ তহবিল বরাদ্দ বাধ্যতামূলক করতে হবে;

০৩ সকল জলবায়ু তহবিল অনুদান-ভিত্তিক, ঋণ নয়: জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয় এমন দেশগুলোকে ঋণের বোঝায় পিষ্ট করা অন্যায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন। সকল তহবিল অবশ্যই Grant-based হতে হবে;

০৪ জলবায়ু শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক আইনি স্বীকৃতি: বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ৫-৭ লাখ মানুষ জলবায়ু-প্রভাবিত অভিধানে বাধ্য হচ্ছে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ২-৩ ক্রোড়ে পৌঁছতে পারে। "Climate Refugee" বা "Climate Displaced Person"-এর আন্তর্জাতিক আইনি সংজ্ঞা ও সুরক্ষা চাই। উন্নত দেশগুলোতে "Climate Visa" পদ্ধতি চালু করতে হবে;

০৫ Enhanced Direct Access (EDA): বাংলাদেশ যেন জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়াই সরাসরি তহবিল পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। PKSF I IDCOL-এর মতো National Implementing Entity (NIE) শক্তিশালী করতে হবে। GCF I Adaptation Fund-এর approval প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করতে হবে;

০৬ প্রযুক্তি হস্তান্তরে IPR বাধা দূরীকরণ: সবুজ প্রযুক্তি-সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি, জলসংরক্ষণ, লবণাক্ত-সহিষ্ণু ফসল-বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে হস্তান্তর করতে হবে এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তিধকার (IPR) যেন বাধা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;

০৭ বর্ণ-ভিত্তিক, লিঙ্গ-ভিত্তিক ও প্রতিবন্ধিতা-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ বাধ্যতামূলকরণ: বর্ণ ও লিঙ্গ অনুযায়ী বিভাজিত তথ্যের অভাব সারগর্ভ সমতা অর্জনের একটি প্রধান বাধা। সকল জলবায়ু প্রকল্প ও তহবিলে Caste-disaggregated, Gender-disaggregated, Disability-disaggregated data সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করতে হবে যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থা জানা যায় এবং তাদের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়;

০৮ জলবায়ু প্রকল্পে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক: Amnesty International যে কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থাকে আহ্বান জানায় যারা বাংলাদেশকে অভিযোজন বা ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থায়ন প্রদান করে তাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সকল প্রকল্প দলিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের পূর্ণ, কার্যকর এবং অর্থবহ ইনপুট দিয়ে ডিজাইন করা হয়, সমতা ও বৈষম্যহীনতার নীতি এবং পরিমাপযোগ্য অন্তর্ভুক্তি ও ইকুইটি মান অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয় এবং অগ্রগতি ও বাস্তবায়নের রিপোর্টিং বর্ণ-বিভাজিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে। দলিত, আদিবাসী, নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

০৯ Climate Justice Framework প্রতিষ্ঠা: জলবায়ু ন্যায়বিচারের নতুন আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োজন যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর প্রাধান্য পাবে, নারী, শিশু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ সুরক্ষা পাবে এবং মানবাধিকার রক্ষা হবে;

১০ Regional Cooperation Mechanism শক্তিশালীকরণ: দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে SAARC, BIMSTEC, Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর মাধ্যমে প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময় এবং যৌথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।



প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি উদ্যোগ: মানবাধিকার-ভিত্তিক কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকার, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমী ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে:

- ০১ **জলবায়ু ন্যায়বিচার আইন (Climate Justice Act) প্রণয়ন:** বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই একটি ব্যাপক বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে হবে যা বর্ণ ও বংশ-ভিত্তিক বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত করে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে প্রযোজ্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্য স্বীকার করে এবং সহজলভ্য স্বাধীন অভিযোগ প্রক্রিয়া ও কার্যকর আইনি প্রতিকার প্রদান করে। এই আইনে জলবায়ু-প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। Climate Litigation সহজ করতে হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় আদালতে প্রতিকার চাইতে পারে;
- ০২ **সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ:** জলবায়ু-প্রভাবিত পরিবারগুলোর জন্য নগদ হস্তান্তর (Cash Transfer), খাদ্য সহায়তা এবং কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প (Employment Guarantee Scheme) চালু করতে হবে। দলিত, বেদে, চর এলাকার বাসিন্দা, আদিবাসী-সবার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে হবে;
- ০৩ **লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও বর্ণ-সংবেদনশীল জলবায়ু কর্মসূচি:** নারী ও দলিত নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, জলবায়ু-সহনশীল জীবিকার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং দুর্যোগের সময় তাদের বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যের কারণে খুলনা ও সাতক্ষীরার নারী পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন কারণ নারী হিসেবে তারা পানি সংগ্রহের বোঝা বহন করেন, যা একটি

অবৈতনিক ও শ্রম-নিবিড় কাজ, যা তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সীমিত করে;

০৪ **আদিবাসী ও স্থানীয় জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রয়োগ:** আদিবাসী ও বেদে সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতি, জলবায়ু পূর্বাভাস এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানগুলো জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের ভূমি অধিকার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং জলবায়ু প্রকল্পে তাদের Free, Prior and Informed Consent (FPIC) নিশ্চিত করতে হবে;

০৫ **সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ:** জলবায়ু-সম্পর্কিত রোগ (ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, তাপঘাত) মোকাবিলায় জন্য স্বাস্থ্য অবকাঠামো শক্তিশালী করতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দলিত কলোনি, বেদে বসতি, চর এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে;

০৬ **জলবায়ু শিক্ষা ও সচেতনতা কর্মসূচি:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার, সরকারি সহায়তা এবং অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। স্কুল পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলিত, আদিবাসী, বেদে শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি চালু করতে হবে;

০৭ **প্রতিবন্ধী-সহায়ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:** সাইক্লোন শেল্টারে র্যাম্প, সাইন ভাষায় সতর্কীকরণ, অডিও বার্তা, এবং বিশেষ সহায়তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জরুরি সহায়তা দল (Emergency Response Team) গঠন করতে হবে;

০৮ **পানি ও স্যানিটেশনে সমতা নিশ্চিতকরণ:** নিরাপদ পানি সংস্থাপন

দলিত কলোনির মধ্যে বা কাছাকাছি স্থাপন করতে হবে, সাশ্রয়ী লাইফলাইন ট্যারিফ গ্রহণ করতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য সৌর বা ব্যাটারি ব্যাকআপ সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সকল জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

০৯ **ভূমি অধিকার ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা:** নদীভাঙা মানুষ, চর এলাকার বাসিন্দা, আদিবাসী, বেদে সম্প্রদায়ের জন্য ভূমি মালিকানা স্বীকৃতি এবং জলবায়ু-প্রভাবিত বাস্তুচ্যুতিতে সরকারি জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিকল্পিত পুনর্বাসন (চষধহহবফ জবষড়পধঃরডহ) কর্মসূচি চালু করতে হবে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের পূর্ণ সম্মতি থাকবে;

১০ **জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ:** বর্ণ-ভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পানি ও স্যানিটেশন পরিকল্পনা সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলিত নারীদের সারগর্ভ সমতা ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। একটি জাতীয় জলবায়ু ন্যায়বিচার কমিশন গঠন করতে হবে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা পর্যবেক্ষণ করবে।

উপসংহার: জলবায়ু ন্যায়বিচার-আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন

COP 30 সম্মেলন শেষ হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের লড়াই শুরু হয়েছে মাত্র। এই সম্মেলনের ফলাফল যদি সত্যিকারভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে কিছুটা স্বস্তি মিলবে, কিন্তু যদি আবারও উন্নত দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহলে বাংলাদেশের ১৭ करोड़ মানুষের-বিশেষত দলিত, বেদে, চর এলাকার বাসিন্দা, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং

বয়স্কদের-মানবাধিকার চরম হুমকির মুখে পড়বে।

বর্ণ ও লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর অভাব, অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণ এবং জলবায়ু দুর্বলতা একত্রিত হয়ে বর্জন ও অসম্মানের চক্র শক্তিশালী করেছে। বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান তীব্র খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও চরম তাপের বিরুদ্ধে কার্যকর স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করতে পারবে না যদি সবচেয়ে অবহেলিত গোষ্ঠীগুলোকে পিছনে ফেলে রাখে।

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা মানে শুধু পরিবেশ রক্ষা নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন-জীবনের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, পানির অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, জীবিকার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং মর্যাদার অধিকার। বাংলাদেশ সরকার, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, গবেষক, মানবাধিকার কর্মী এবং সাধারণ মানুষ-সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষিত হয়।

জলবায়ু ন্যায়বিচার শুধু একটি স্লোগান নয়, এটি আমাদের-বিশেষত দলিত, বেদে, চর এলাকার বাসিন্দা, আদিবাসী এবং সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর-অস্তিত্বের প্রশ্ন। এখন সময় এসেছে বিশ্ববৈবেককে জাগানোর, প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবায়নে যাওয়ার এবং একটি ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানবাধিকার-কেন্দ্রিক জলবায়ু ভবিষ্যৎ তৈরির-যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না, যেখানে দলিত নারী বিপুল পানি পাবে, বেদে শিশু স্কুলে যেতে পারবে, চর এলাকার কৃষক নিজের জমিতে ফসল ফলাতে পারবে, আদিবাসী তার বন ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে এবং সকল মানুষ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে।

মোহন রবিদাস

এ্যাডভোকেসি অফিসার, নাগরিক উদ্যোগ
rdmohan.nu@gmail.com